কাঁচামিঠে

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩১/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট • কলিকাতা

আড়াই টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

উৎসর্গ

রসিক ও রাসায়নিক বন্ধু

ডাক্তার **বীরেন্দ্রকুমার নন্দী**

M. Sc., (Cal.), Ph. D. (Manchester),
A. I. C. (Lond.)

করকমলেষু—

মালাড্, বম্বে
৭ বৈশাখ, ১৩৪৯

গ্রন্থকার

সূচী

বিজয়ী

ননীগোপালের অন্তর্জীবনের গোপন ইতিহাসটি উদ্ঘাটিত করিতে গিয়া কেবলি ভয় হইতেছে, তাহার ভিতর ও বাহিরের এই বৈষম্য লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইবে কিনা। প্রসন্ন হ্রদের গূঢ় তলদেশে যে সকল ভীষণ নক্র ঘুরিয়া বেড়ায় তীরে দাঁড়াইয়া তাহাদের কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না। ননীগোপালের সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ ও সুশ্রী কিশোর মুখখানা দেখিয়াও কেহ সন্দেহ করিত না যে কি দুর্জ্জয় দুর্ব্বলতার সহিত সে অহরহ যুদ্ধ করিতেছে।

যে নক্রটি ননীগোপালের দেহ-মনের মধ্যে অটল আসন গাড়িয়া বসিয়াছিল তাহার নাম—ভয়। আহার, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি কয়েকটা বৃত্তি জীবমাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইতে বড় একটা কাহাকেও দেখা যায় না। কিন্তু ননীগোপালকে ঐ ভয় বস্তুটি ছেলেবেলা হইতে একটু বিশেষ করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল।

কি করিয়া কখন ইহার প্রথম উন্মেষ হইল তাহা বলা শক্ত। শিশু কখন তাহার একান্ত সহজ নির্ভীকতা বিসর্জ্জন দিয়া বিড়াল দেখিয়া বা অন্ধকারে ভয় পাইতে আরম্ভ করে তাহা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিশ্চয় বলিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস ননী মাতৃস্তন্য ও পিতৃরক্তের সহিত এই পরম পদার্থটি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিল। সে যাক্। শুধু ননীর মাতাপিতার অকারণ গ্লানি করিলে চলিবে কেন?

ননীর যখন সাত বৎসর বয়স তখন তাহাদের সহরে একটা সার্কাস আসিয়াছিল। ননীর পরম বন্ধু বিশু আসিয়া চুপিচুপি বলিল,—'ননে, বাঘ দেখতে যাবি? সার্কাসে অনেক বাঘ এসেছে। এক পয়সা দিলেই দেখতে দেয়। তোর মার কাছ থেকে দুটো পয়সা নিয়ে আয়—দুজনে দেখব।'

ননী উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—'আচ্ছা এক্ষুণি আন্‌ছি।'

বিশু সাবধান করিয়া দিল, 'বাঘের নাম করিসনি, তাহলে যেতে দেবে না। বলিস কাটি-বরফ্ খাব।'

পয়সা লইয়া দুই বন্ধু বাহির হইল। তারপর যথাসময়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ননী একাকী বাড়ী ফিরিয়া আসিল। জননী ননীর কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখিয়া প্রথমটা তাহাকে খুব ঠেঙাইলেন, তারপর সেই সন্ধ্যাবেলা স্নান করাইয়া দিলেন। জেরায় প্রকাশ পাইল যে একটা বাঘ ননীকে দেখিয়া গাঁক্ করিয়া শব্দ করিয়াছিল—তাহাতেই এই বিপত্তি।

ননীর জীবনে এই শেষ প্রকাশ্য লাঞ্ছনা, ইহার পর সে ভয় গোপন করিতে শিখিল।

কিন্তু ননীর প্রাণে আর সুখ রহিল না। যত তাহার বয়স বাড়িতে লাগিল ভীতিপ্রদ বস্তুর সংখ্যাও জগতে ততই অগণ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে এমনি হইল যে গুরুজনের সম্মুখে যাইতে তাহার পা কাঁপে, হেড মাষ্টার মহাশয়ের মুখের পানে চোখ তুলিতে প্রাণ শুকাইয়া যায়। যে দিকে সে চোখ ফিরায় সেইদিকেই যেন একটা বিভীষিকা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

যখন তাহার বয়স দশ বৎসর তখন একদিন সে স্কুল হইতে একাকী বাড়ী ফিরিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে কে তাহাকে ডাকিল।

ননী ফিরিয়া দেখিল রতন। রতন ছেলেটা ননীর অপেক্ষা উঁচু ক্লাশে পড়ে বটে কিন্তু সে প্যাঁকাটির মত রোগা এবং অত্যন্ত পাজী। ননীর সহিত তাহার বড় সদ্ভাব ছিল না, তাহাকে আসিতে দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। একবার ভাবিল দৌড়িয়া পালায়। কিন্তু ভয়ের বাহ্য বিকাশ সে অনেকটা দমন করিয়াছিল, তাই পলাইল না, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রতন কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া সটান বলিল,—'তোর এরোপ্লেনটা দে।'

ননী অনেক পরিশ্রম করিয়া বিস্তর মাথা খাটাইয়া একটি পিজ-বোর্ডের ছোট্ট এরোপ্লেন তৈয়ার করিয়াছিল। সেটিকে ছুঁড়িয়া দিলে ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিত, আবার চক্রাকারে নামিয়া আসিত। এটির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়া আজ প্রথম সে স্কুলে আনিয়াছিল এবং চমৎকৃত বন্ধুবর্গের সম্মুখে এই অদ্ভুত যন্ত্রটির অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়া নিরতিশয় ঈর্ষ্যা ও প্রশংসার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

ননীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রতন দাঁতমুখ খিচাইয়া বলিল,—'দিবিনে? শীগ্‌গির দে বল্‌ছি।'

প্রবল রোদনোচ্ছ্বাস সম্বরণ করিয়া ননী বলিল,—'আমি তৈরী করেছি, আমি তোমাকে দোব কেন?'

'দিবিনে? আচ্ছা দাঁড়া তবে—'বলিয়া রাস্তা হইতে একমুঠা ধূলা তুলিয়া লইয়া বলিল,—'এক্ষুণি চোখে ধূলো দিয়ে দোব, কানা হয়ে যাবি। ভাল চাস ত দে বল্‌ছি।'

ননী এরোপ্লেনটা রাস্তার উপর ফেলিয়া দিয়া বিকৃত কণ্ঠে কহিল,—'এই নে—ভারী ত জিনিস! আবার আমি আর একটা তৈরী করে নোব।'

সেটা তুলিয়া লইয়া দাঁত বাহির করিয়া রতন বলিল,—'খবরদার বল্‌ছি, জিভ টেনে বার করব ফের যদি এরোপ্লেন তৈরী করিস। আমি একলা এরোপ্লেন ওড়াব আর কাউকে ওড়াতে দোব না।'—এই বলিয়া কাটির মত হাতপা অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাড়িতে নাড়িতে শিস্‌ দিতে দিতে রতন চলিয়া গেল।

ননী বাড়ী ফিরিয়া বইগুলা ফেলিয়া দিয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। শুধু যে এরোপ্লেনের শোকেই সে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নয়, দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য ছেলের মত লড়াই করিবার ক্ষমতাও যে তাহার নাই, এই লজ্জাটাই তাহাকে সব চেয়ে বেশী পীড়া দিতে লাগিল।

এই সমস্ত ছোটখাট ব্যাপার ছাড়াও ননীর পক্ষে সব চেয়ে ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—সাহেব। কি করিয়া এই ভয়ের সৃষ্টি হইল বলা যায় না কিন্তু লাল মুখ কিম্বা সাদা চাম্‌ড়া দেখিলেই ননীর মুখ শুকাইয়া তুলসীপাতা হইয়া যাইত, অকারণে বুকের ভিতর দুরদুর করিতে থাকিত। ননী নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত ভয়ের কিছু নাই—সাহেব তাহাকে খাইয়া ফেলিবে না, কিন্তু কোনই ফল হইত না। কোন্‌ নীলকরের আমলের পূর্ব্বপুরুষের রক্ত তাহার সমস্ত যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধিবিবেচনাকে ভাসাইয়া দিত।

স্কুলের হেডমাষ্টার যখন ননীর বাবাকে লিখিলেন,—ননীর মত শান্ত শিষ্ট নিরীহ ছেলে আমার স্কুলে আর নাই—আমি এ বৎসর উহাকে গুডকন্‌ডক্ট প্রাইজ দিব,—তখন ননী লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে যেন মরিয়া গেল। এই প্রাইজ যে তাহার আন্তরিক শিষ্টতার জন্য নয়, তাহার ভীরুতার, দুষ্কৃতি করিবার অক্ষমতার পুরস্কার, তাহা পরিষ্কার করিয়া না বুঝিলেও উহার সুতীক্ষ্ণ লজ্জা তাহার বুকের

মধ্যে বিঁধিয়া রহিল। নিজের যে দুর্ব্বলতাকে সে অতিযত্নে লোক-চক্ষু হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, এই প্রাইজটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে উহা সকলের কাছে প্রকট হইয়া পড়িবে, কাহারও জানিতে বাকী থাকিবে না, তাহা ভাবিয়া তাহার নিজের মাথাটা দেয়ালে ঠুকিয়া ছেঁচিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইল। সহিংসভাবে একটা কথা কেবলি তাহার মনে আনাগোনা করিতে লাগিল যে, প্রাইজ না পেযে যদি রত্নার মত মিশনস্কুলের ছেলেদের ঢিল মারার জন্যে বেত খেতুম তাহলে কত ভালই না হত ?

এইভাবে ভযসঙ্কুল ম্রিয়মাণ দিনগুলি ননীর কাটিতে লাগিল।

ননীর ষোল বছর বয়সে এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে তাহার জীবনের উপর ধিক্কার জন্মিয়া গেল। আবার সহরে সার্কাস আসিয়াছে। এবার আর বাঘ দেখা নয়, স্কুলের ছেলেবা মিলিয়া আসল সার্কাস দেখিতে গেল। সেদিন ম্যাটিনে, স্কুলের ছেলেদের কনশেশন্ ছিল, তাই ননীরা কযেকজন আট আনার টিকিট কিনিয়া এক টাকার চেয়ারে গিয়া বসিল। ননী একটা ভাল জায়গা দেখিয়া দল ছাড়িয়া একটু আলাদা হইয়া বসিল।

সার্কাস আরম্ভ হইতে আর দেরী নাই, দর্শকদের বসিবার স্থান সব ভরিয়া গিয়াছে, এমন সময় একজন ছোকরা সাহেব প্যাণ্টালুনের পকেটে দুই হাত পুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ননীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—'এই, ওঠ। এটা আমার যায়গা।'

ননী ফ্যাল ফ্যাল করিযা তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। সাহেব চেয়ারের পিঠে একটা নাড়া দিয়া বলিল,—'শুনতে পাচ্চ ? এটা আমার চেয়ার—ওঠ।'

ননীর মুখে তবু কথা নাই; তাহার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে।

সাহেব তখন ঘাড়ের জামা ধরিয়া ননীকে তুলিয়া দিয়া নিজে চেয়ারটা অধিকার করিয়া বসিল।

সমস্ত পৃথিবী ননীর চক্ষে অন্ধকার হইয়া গেল। আচ্ছন্নভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হোঁচট খাইতে খাইতে বাহিরের দিকে চলিল।

সার্কাস শুদ্ধ লোক চক্ষু মেলিয়া এই দৃশ্যাভিনয় দেখিতেছিল। বিশু ননীর কামিজ ধরিয়া টানিয়া চাপা গলায় বলিল,—'ছেড়ে দিলি—কিছু বল্লি নে? আমি হলে—'

বিমল নিজের চেয়ারের একপাশে সরিয়া বসিয়া বলিল,—'আয় ননী এইখানে বস।'

ননী অতিকষ্টে গলা হইতে আওয়াজ বাহির করিল,—'না, আমি বাড়ী যাই।'

সে রাত্রে ননী ঘুমাইতে পারিল না। গভীর রাত্রে একবার তাহার ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া কাঁদে। কিন্তু বালিশ কামড়াইয়া অনেক কষ্টে সে ইচ্ছা রোধ করিল। হঠাৎ একবার বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ঘরের কোণ হইতে হকি-ষ্টিকখানা তুলিয়া লইয়া দুই হাতে মড়াৎ করিয়া ভাঙিয়া দুখানা করিয়া ফেলিল। নিজের মনে পাগলের মত বলিতে লাগিল,—'কেন আমি এমন—কেন আমি এমন? ভীতু—ভীতু! উঃ! সব্বাই দেখলে। সব্বাই হাসলে! কাল স্কুলে যাব কি করে?'

এই ঘটনার পর ননী যেন কেমন এক রকম হইয়া গেল, যেন কচ্ছপের মত নিজেকে নিজের মধ্যে গুটাইয়া ফেলিল। বন্ধুদের সঙ্গে

কথাবার্ত্তা হাসি-গল্প প্রায় বন্ধ করিয়া দিল। সর্ব্বদা একলা ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নিজের মনে বিজবিজ করিয়া কি বকে!

বিমল একদিন লক্ষ্য করিয়া বলিল,—'ত্যাখ্ ননেটা কি রকম হ'য়ে গেছে—কথাও কয় না।'

বিশু বিজ্ঞভাবে বলিল,—'একজামিনের পড়া পড়ছে, তোর মত ফাঁকিবাজ ত নয়! ওর বাবা বলেছেন ফার্ষ্ট হয়ে সেণ্ট আপ্ হতে পারলে একটা সোনার রিষ্ট্ ওয়াচ দেবেন।'

বিশুর অনুমান কিন্তু সর্ব্বৈব ভুল। ননী রিষ্ট্ ওয়াচের লোভে পড়া মুখস্থ করিত না। সে বিড়বিড় করিয়া কেবলি বকিত,—আমি ভীতু নই! আমার সাহস আছে! আমি কাউকে ভয় করি না। এবার যে আমার সঙ্গে চালাকি করবে তাকে দেখে নেব। ইত্যাদি। যেন খাঁচার পাখী নিরন্তর ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া খোলা আকাশের মুক্তি-মন্ত্র জপ করিতেছে।

মাসখানেক পরে একদিন বিশু আসিয়া বলিল, 'ননী, মাঠে চল্, আজ মিশন স্কুলের সঙ্গে আমাদের ম্যাচ আছে।'

জনসঙ্ঘ বা যেখানে অনেক লোকের সমাবেশ সেখানে যাইতেও ননী মনে মনে ভয় পাইত। তাই সে জোর করিয়া বলিল,—'আচ্ছা, চল।'

মাঠে ভীষণ ভীড়। অন্যান্য দর্শক ছাড়াও দুই স্কুলের ছেলেরা দলে দলে আসিয়া মাঠ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফুটবল খেলায় এই দুই স্কুলে চিরদিন ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে। কোন্ স্কুল বেশী ভাল খেলে তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজ পর্য্যন্ত হয় নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত কবে হইবে তাহা বলিবার ক্ষমতা বোধ করি ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিদের পর্য্যন্ত নাই।

খেলা আরম্ভ হইল। দুই পক্ষের দর্শকই নিজ নিজ খেলোয়াড়দের

কখনো ভৎর্সনাপূর্ণ উগ্রকণ্ঠে, কখনো মিনতিভরা করুণস্বরে উৎসাহিত করিতে লাগিল। কিন্তু যুযুৎসু দুই দলই সমান দুর্দ্ধর্ষ—কেহই গোল দিতে পারিল না। খেলা দেখিতে দেখিতে দর্শকবৃন্দ ভীষণ উত্তেজিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল।

শেষে খেলা সমাপ্ত হইতে যখন আর মিনিট পাঁচেক বাকী আছে তখন ননীদের স্কুল একটা গোল দিল। 'গোল' 'গোল' শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ছাতা জুতা প্রভৃতির উৎক্ষেপ দ্বারা এই বিজয় কাণ্ডের আনন্দ নির্ঘোষিত হইল।

ননী যেখানে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছিল, তাহারই পাশে একটা বছর আটেকের ছেলে লাফাইয়া নাচিয়া ডিগ্‌বাজী খাইয়া চীৎকার করিতেছিল,—'গোল! গোল! হুর্‌রে! আমার দাদা গোল দিয়েছে। হুর্‌রে! গোল! গোল!' খেলা আবার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তখনো ছেলেটা অক্লান্তভাবে চেঁচাইয়া চলিয়াছে।

তাহার কাছে দাঁড়াইয়া মিশন স্কুলের একটি ফিরিঙ্গি ছেলে খেলা দেখিতেছিল। গোল খাইবার পর সে বিশেষ একটু মুষ্‌ড়িয়া গিয়াছিল, তাহার উপর এই পুঁটে ছেলেটার উৎকট আনন্দ তাহার অসহ্য বোধ হইল। সে ছেলেটার চুলের মুঠি ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল,—'এই, চুপ কর্‌—পাজী কোথাকার!'

ছেলেটা তাহার উদ্দাম উল্লাসে হঠাৎ বাধা পাইয়া আরও জোরে চেঁচাইয়া উঠিল,—'অ্যাঁ—অ্যাঁ—আমায় মারছে—'

ফিরিঙ্গি ছেলেটি আচ্ছা করিয়া তাহার কাণ মলিয়া দিয়া বলিল, —'চুপ কর্‌—নইলে এক কিক্ মেরে তোকে ঐ গাছের ডগায় তুলে দেব।'

পুঁটে ছেলেটার সাঙ্গোপাঙ্গ বোধ হয় সেখানে কেহ ছিল না,

তাই সে ননীকে দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—'ও ননীদা দেখ না, আমায় মারছে—'

ননীর মনে হইল, তাহার গলাটা যেন কে চাপিয়া ধরিয়াছে—বুকের ভিতর অসম্ভব রকম ধড়ফড় করিতে লাগিল। মুখ একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল।

সে কম্পিতস্বরে বলিল,—'ওকে ছেড়ে দাও—ঐটুকু ছেলেকে মারছ কেন?'

ফিরিঙ্গি ছেলেটি মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—'ঐটুকু ছেলে? পাজী বজ্জাত রাস্কেল কোথাকার!' বলিয়া ছেলেটার মাথায় এক গাঁট্টা বসাইয়া দিল। ছেলেটা তারস্বরে কান্না জুড়িয়া দিল।

খেলার দিকেই তখন সকলের বাহ্যেন্দ্রিয় নিবিষ্ট হইয়াছিল, এদিকের এই পার্শ্বাভিনয় কেহ লক্ষ্য করিল না।

ননী অস্বাভাবিক একটা তর্জ্জন করিয়া কহিল,—'ছেড়ে দাও বল্‌ছি, নইলে ভাল হবে না।'

রোদন-রত ছেলেটাকে ছাড়িয়া দিয়া ফিরিঙ্গি ছেলেটি ননীর মুখের খুব কাছে মুখ আনিয়া বলিল,—'লড়্‌তে চাও? আচ্ছা—চলে এস!'

কি করিয়া যে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহা ননীর ঠিক মনে নাই। হঠাৎ সে দেখিল সে ফিরিঙ্গি ছেলেটির সহিত দারুণ লড়াই সুরু করিয়া দিয়াছে।

মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের ঘিরিয়া একটা চক্র রচনা হইয়া গেল এবং যাহারা ফুটবল খেলা দেখিতেছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই নূতন খেলা দেখিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ফিরিঙ্গি ছেলেটি বোধ হয় মুষ্টিযুদ্ধ কিছু কিছু জানিত, তাই প্রথম হইতেই ঘুষি চালাইয়া ননীর নাক মুখ ভাঙ্গিয়া দিবার উপক্রম করিল।

ননী কিন্তু মরিয়া হইয়া লাগিয়া রহিল। দুজনের বয়স প্রায় সমান—শরীরও সমান বলবান বলিয়া বোধ হয়। লড়াই বেশ জমিয়া উঠিল।

ননী একবার লেঙ্গি দিয়া প্রতিপক্ষকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল এবং তাহার মুখে মাথায় অপটু হস্তে কিল মারিয়া তাহাকে কাবু করিবার চেষ্টা করিল। ফিরিঙ্গি ছেলেটি কিন্তু ননীকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে ঘুষি চালাইয়া ননীর পেট ও মুখ থেঁতো করিয়া দিতে লাগিল। ননীর অবস্থা যায় যায় হইয়া উঠিল!

কিন্তু ননীর মনে ভয়ের লেশমাত্র নাই—সে তখন যুদ্ধের উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে! হারজিত যে অতি গৌণ ব্যাপার,—যুদ্ধটাই যে চরম সার্থকতা—এই মহৎ সত্য ননীর শিরায় শিরায় তখন নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে।

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়া ননী ফিরিঙ্গি ছেলেটির একেবারে ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল এবং দুই হাতে তাকে ভাল্লুকের মত চাপিয়া ধরিয়া পিষিতে আরম্ভ করিল। ধৃতরাষ্ট্র যেমন করিয়া লৌহভীম চূর্ণ করিয়াছিল এ যেন কতকটা তাই!

ফিরিঙ্গি ছেলেটি আর ঘুষি চালাইতে না পারিয়া প্রাণপণে ননীর আলিঙ্গনমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ননী তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গে আঠার মত লেপটাইয়া গিয়াছে। তাহার বাহুবন্ধন ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছে!

ক্রমশঃ ফিরিঙ্গি ছেলেটির মুখ নীলবর্ণ হইয়া উঠিল! সে বন্ধনমুক্ত হইবার একটা শেষ চেষ্টা করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—'হয়েছে, এবার ছেড়ে দাও—pax—শান্তি!'

ননী ছাড়িয়া দিতেই দুজনে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল।

প্রথমে ফিরিঙ্গি ছেলেটি হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—'তোমার গায়ে খুব জোর ত! বক্সিং জান্‌লে কোন্ কালে তুমি আমায় হারিয়ে দিতে।'

ননী তাহার সহিত শেকহ্যাণ্ড করিয়া উৎফুল্ল ভাবে বাংলা ইংরাজীতে মিশাইয়া বলিল,—'তুমি খুব ভাল বক্সিং জানো—না? উঃ কি কিলটাই মেরেছ—এই দেখ ঠোঁট কেটে গেছে।'

ফিরিঙ্গি ছেলেটি হাসিয়া বলিল,—'তুমি শিখবে? আমি ভাল জানি না বটে কিন্তু তোমাকে শেখাতে পারব।'

ননী মহা আগ্রহে বলিল, 'হ্যাঁ শিখব। কাল থেকেই তাহলে—হ্যাঁ—কি বল?'

—'আচ্ছা।'

—'তোমার নাম কি? আমার নাম ননী—ননী গাঙ্গুলী।'

—'আমার নাম ডিক্—ডিকি ফ্রাঙ্ক্‌লিন।'

ডিক্ চলিয়া গেলে পর ননীর বন্ধুবান্ধব ননীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ফুটবল ম্যাচ তখন শেষ হইয়া গিয়াছে।

বিশু সগর্ব্বে তাহার পিঠ ঠুকিয়া বলিল,—'সাবাস খলিফা, হিম্মৎ দেখিয়েছিস বটে! আমি বরাবরই জানি ননেটা চুপচাপ থাকে বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ও একটা আসল গুণ্ডা! এঃ—ননী, চোখটা একেবারে বুজে গেছে যে!'

ননী একটিমাত্র দৃষ্টিক্ষম চক্ষু ও পটলের মত স্ফীত ওষ্ঠপুট লইয়া একগাল হাসিয়া বলিল,—'ও কিছু নয়—কালই সেরে যাবে। ডিক কিন্তু বেশ ছেলে—না?'

সেদিন হল্লা করিতে করিতে, গান গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিবার পথে ননী জীবনে প্রথম পরিপূর্ণ মুক্তির আস্বাদ পাইল। যে রাক্ষসটা এতদিন তাহাকে মুঠির মধ্যে পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছিল, আজ স্বহস্তে সেই রাক্ষসকে বধ করিয়া যেন বিজয়ীর ললাটিকা পরিয়া সে বাড়ী ফিরিল।

উল্কার আলো

এ গল্পের নামকরণ ভুল হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত পড়িবার ধৈর্য্য যাঁহার আছে, তিনিই এ কথা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহার সে ধৈর্য্য নাই, তাঁহাকে গোড়াতেই জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে ইহার নাম হওয়া উচিত ছিল—"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং" ; কিম্বা "পুরুষস্য ভাগ্যং" ; অথবা "দেবা ন জানন্তি"—। বম্বে ফিল্মের মত শুনাইতেছে, কি করিব, আমি নাচার।

গল্পের শীর্ষদেশে একটা নাম জুড়িয়া দিবার প্রথা কোন্ অর্ব্বাচীন আবিষ্কার করিয়াছিল? গল্পের আখ্যানবস্তুর সহিত ঐ শিরোনামার একটা অর্থগত সংযোগ থাকিবারই বা আবশ্যকতা কি? "শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী"র পরিবর্ত্তে বইখানার নাম "বিরূপাক্ষের বীরত্ব" হইলেই বা পৃথিবীর কি অনিষ্ট হইত? "যোগাযোগ" যদি "তিন পুরুষ"ই থাকিত, তাহা হইলে কি সৃষ্টি রসাতলে যাইত? বর্ত্তমান লেখকের একটা নাম আছে কিন্তু নামের সঙ্গে মানুষটার একটুও সাদৃশ্য নাই। তাহাতে কি ক্ষতি হইয়াছে? What's in a name?

এ সকল গুরুতর প্রশ্নের উত্তর আপনারা দিতে পারিবেন না, অতএব সে জন্য অপেক্ষা করিয়া আপনাদের অপ্রতিভ করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে নিদারুণ সংবাদটি দিয়া আপনাদিগকে সচকিত করিয়া তুলিবার অভিলাষ করিয়াছি, তাহা এই,—সুনীলা ওরফে বিল্লুর বয়স এখন সতের বৎসর ; এবং তাহার মত ফাজিল, চপল ও হৃদয়হীনা যুবতী আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই। অনুরূপকে সে—

কিন্তু সব কথাই সুরু হইতে বলা কর্ত্তব্য। কবিবর বলিয়াছেন,—

আরম্ভের পূর্ব্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো—অর্থাৎ বাবারও বাবা আছে; অন্ততঃ থাকিলে ভাল হয়।

এই বিল্লুর বয়স যখন আট বৎসর ছিল তখন তাহার কাঁচা রকম একটা বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। নিতান্তই হাসিঠাট্টার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া এই সম্বন্ধ ভ্রূণ অবস্থাতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। বিল্লুর বাবা প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বেহারীবাবু সদরে বদ্‌লী হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পঞ্চদশ বর্ষীয় বিজয়লালের সহিত স্থানীয় বড় উকিল নিমাইবাবুর পুত্র অনুরূপচন্দ্রের বেজায় বন্ধুত্ব জন্মিয়া গিয়াছিল। এইসূত্রে অনুরূপ প্রায়ই বিল্লুদের বাড়ী যাইত। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুত্ব এমনই গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে স্কুলে এবং স্কুলের বাহিরে এই দুটিকে কদাপি পৃথক্ অবস্থায় দেখা যাইত না। বিজয়কে বাড়ীতে না পাইলে সকলে বুঝিত, সে অনুরূপের বাড়ীতে আছে এবং অনুরূপকে বাড়ীতে না পাওয়া গেলেও—তদ্বৈবচ।

হুঁ। পাঠক ভাবিতেছেন—কিন্তু তাহা ভুল। বরঞ্চ ঠিক তাহার উল্টা। বন্ধু-ভগিনীর অত্যাচারে অনুরূপের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। পাৎলা মুখের উপর বড় বড় বিস্ফারিত দুইটি চোখ, লাল টুক্‌টুকে দুইখানি ঠোঁট—বিল্লুকে দেখিয়া সহসা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না যে, তাহার ঐ আটবছরের ক্ষুদ্র মস্তকের মধ্যে এতপ্রকার দুষ্ট বুদ্ধি সঞ্চিত হইয়া আছে, বয়োজ্যেষ্ঠদেরও তাহাকে আঁটিয়া উঠিবার জো নাই। অনুরূপ এক সময় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ভাবিত, জ্বালাতন করিবার এমন অপরিসীম শক্তি এই ক্ষুদে মেয়েটা কোথা হইতে লাভ করিল? নেহাৎ বন্ধু-ভগিনী বলিয়াই সে নীরবে সহ্য করিয়া যাইত, নচেৎ—

কাল্পনিক প্রতিহিংসা-বিলাসে দাঁত কড়মড় করিয়াই তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইত।

প্রথম দিন বন্ধুর গৃহে পদার্পণ করিবামাত্রই বিল্লু কর্ত্তৃক অনুরূপের নির্য্যাতন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। বড় বড় চোখে কিছুক্ষণ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিল্লু গম্ভীরভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"তুমি বুঝি দাদার একটা বন্ধু? দাদা সব যায়গায় তোমার মতন একটা বন্ধু করে। তোমার নাম কি?"

অনুরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজের ডাকনামটা বলিয়া ফেলিয়াছিল।

নাম শুনিয়া বিল্লু নাক সিঁটকাইয়া বলিয়াছিল,—"নাকু? এ রাম! বিচ্ছিরি নাম। আমার নাম বিল্লু—ভাল নাম সুনীলা। তোমার চুল অমন খোঁচা-খোঁচা কেন?"

প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া বিল্লু অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল,—"তুমি কাণ নাড়তে পারো—না? হাঁ পারো। অত বড় বড় কাণ নাড়তে পারো না? নিশ্চয় পারো। একটু নাড়ো না দেখি।" বলিয়া ঘাড় হেলাইয়া স্থিরদৃষ্টিতে তাহার কাণের দিকে তাকাইয়াছিল।

অনুরূপ কান নাড়িতে পারে নাই, কেবল উদ্দিষ্ট ইন্দ্রিয় দুটা অতিরিক্ত মাত্রায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

এইভাবে আরম্ভ হইয়া চক্রবৃদ্ধি হারে বিল্লুর অমানুষিক উৎপীড়ন বাড়িয়া চলিয়াছিল। ইহার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস লিখিয়া পৃথিবীর দুঃখভার আর বাড়াইব না, দুই একটা ছোটখাট উদাহরণ দিয়া এই নৃশংসতার চিত্রের উপর যবনিকা টানিয়া দিব।

বিজয় ও অনুরূপ দুই বন্ধুতে মিলিয়া একত্র একটা ফটোগ্রাফ তোলাইয়াছিল। ছবিটি বিজয়ের পড়িবার টেবিলের উপর সযত্নে

সাজানো ছিল। একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া বিজয় দেখিল, ছবি হইতে অনুরূপের মুণ্ডটি কে সাবধানে কাঁচি দিয়া কাটিয়া লইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে সচিত্র রামায়ণ হইতে হনুমানের মাথাটি কর্ত্তিত করিয়া সেই স্থানে জুড়িয়া দিয়াছে। এ কাহার কার্য্য, তাহা বুঝিতে বিজয়ের বিলম্ব হইল না। বন্ধুর প্রতি এই অপমানে সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বিল্লুব চুলের বিনুনি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সগর্জ্জনে কহিল,—"এ কি করেছিস ?"

বিল্লু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল,—"আমি জানি না !"

"জানি না ? রাক্কুসী কোথাকার ! শীগ্‌গির আসল মুণ্ডটা দে।"

"আমি জানি না ! আসল মুণ্ডই তো রয়েছে—" বলিয়া বিল্লু খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, এই আট বৎসর বয়েসেই বিল্লু মেয়েটি কিরূপ পরিপক্ক ও ফাজিল হইয়া উঠিয়াছে।

বিজয় তর্জ্জন করিয়া বলিল,—"দিবিনে আসল মুণ্ড ? দে বল্‌ছি—"

"দেব না, যাও।"

এমন সময় অনুরূপ আসিয়া উপস্থিত হইল। ছবিতে নিজের মুখাবয়বের শোচনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া সেও নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও মর্ম্মাহত হইল; কিন্তু অনেক ধবস্তাধ্বস্তি করিয়াও দুই বন্ধুতে বিল্লুর নিকট হইতে অনুরূপের আসল মুণ্ড আদায় করিতে পারিল না। শেষ পর্য্যন্ত অত আদরের ছবিটা ফেলিয়া দিতে হইল।

বলা বাহুল্য, সে মুণ্ড আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বিল্লু সে মুণ্ড লইয়া কি করিল ? এ প্রশ্নের উত্তর আছে —পাঠক খুঁজিয়া দেখুন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটিয়াছিল আর একদিন সকাল বেলা। অনুরূপ বিজয়ের পড়িবার ঘরে একাকী বসিয়া অঙ্ক কষিতেছিল, এমন সময় বিল্লু

আসিয়া পিছন হইতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদরের সুরে বলিল,—"নাকুদা—"

নিরুৎসুকভাবে নিজের কণ্ঠ বাহুমুক্ত করিয়া লইয়া অনুরূপ বলিল,—"কি ?"

বিল্লু ভাসা ভাসা ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া বলিল,—"আমায় দু'টো ফুল পেড়ে দেবে, ভাই ?"

সন্দিগ্ধভাবে অনুরূপ বলিল,—"কি ফুল ?"

"চাঁপা ফুল। ফটকের পাশে ঐ বড় গাছটায় অনেক ফুটেছে। পেড়ে দাও না—খেলাঘরের শিবপূজা করব।"

"আমি এখন পারব না—অঙ্ক কষছি। মালীকে বলগে যাও।"

"মালী দিচ্ছে না।—তুমি চল না, নাকুদা, লক্ষীটি। তুমি খুব গাছে চড়তে পার—তোমার মত কেউ পারে না।"

অনুরূপের সন্দেহ দূর হইল না ; কিন্তু এতখানি কৈতববাদ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও তাগার ছিল না। সে বলিল,—"আচ্ছা, চল।"

গাছের কাছে উপস্থিত হইয়া সে একবার ভাল করিয়া চারিদিক্ দেখিয়া লইল, কোথাও বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা। তারপর গাছে চড়িতে প্রবৃত্ত হইল।

বিল্লু গাছের শীর্ষদেশ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিল,—"ঐখানে অনেক ফুল আছে, নাকুদা,—একেবারে আগায়।"

গাছের ডগা পর্য্যন্ত অসন্দিগ্ধ-চিত্তে উঠিয়া হঠাৎ অনুরূপ বুঝিতে পারিল কি সাংঘাতিক ফাঁদে সে পা দিয়াছে। সে একটি চীৎকার ছাড়িয়া যথাসম্ভব দ্রুত নামিতে নামিতে বলিতে লাগিল,—"পোড়ারমুখী বাঁদরী, দাঁড়া, আজ তোকে মজা দেখাচ্ছি।" গাছের অর্দ্ধেক নামিয়া সেখান হইতেই সে মাটীতে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু বিল্লু তখন

উচ্চকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে গ্রীবাভঙ্গে পিছু ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে হরিণশিশুর মত ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

অনুরূপ সেখানেই বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে সর্ব্বাঙ্গ চুলকাইতে লাগিল। কিন্তু তখন শত শত মধুপিঙ্গলবর্ণ বিষধর কাঠ-পিঁপড়া তাহার সারাদেহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনুরূপ তাহার গায়ের জামাটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু কেবল জামা খুলিলে কি হইবে? একটু ইতস্ততঃ করিয়া, শেষে গায়ের জ্বালায় অস্থির হইয়া সে একটা যুঁই ফুলের ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং সেখানে বসিয়া নগ্নদেহে বিষাক্ত অন্তঃকরণে প্রাণপণে গা চুলকাইতে লাগিল।

বন্ধু বিজয় আসিয়া যখন তাহাকে উদ্ধার করিল, তখন তাহাব সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। নূতন কাপড় পরিতে পরিতে অনুরূপ হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—"আর কখখনো তোদের বাড়ী আসব না, বিজয়। ঐ বিল্লুটা যতদিন—" বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে হন্‌হন্‌ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। বিল্লুর দুষ্কৃতির কথা জানিতে কাহারও বাকী রহিল না। সে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলিল,—"গাছে পিঁপড়ে ছিল, আমি কি ক'রে জান্‌ব?" কিন্তু তাহার এ কৈফিয়ৎ ধোপে টিঁকিল না, মালীর নিকট হইতে প্রকাশ পাইল যে, বিল্লু দিদি তাহাকেই প্রথমে গাছে চড়িয়া ফুল পাড়িতে অনুরোধ করিয়াছিল; কিন্তু গাছে ভয়ানক কাঠ-পিঁপড়ে আছে বলিয়া মালী রাজী হয় নাই। ইহার পর—

ফলে বিল্লু মা বাবার কাছে বিস্তর তিরস্কার ও বিজয়ের কাছে একটা কিল ও দুইটা চড় খাইল। বিল্লু রাত্রিতে তাহার বিবাহিতা দিদি অনিলার কাছে শয়ন করিত। অনিলা শুইতে গিয়া বিল্লুকে বলিল,—"তুই যে নাকুর ওপর অত উৎপাত করিস, ওর সঙ্গে আমরা তোর

বিয়ের সম্বন্ধ করেছি, তা জানিস ? ও যখন উল্টে তোর উপর শোধ তুলবে, তখন কি করবি ?"

বিল্লু ঘৃণাভরে দুই আঙ্গুল দিয়া নাক টিপিয়া ধরিয়া বলিল,—"এ রাম—ওকে আমি বিয়ে করব না। খরগোসের মতন কাণ, চুল খোঁচা খোঁচা—ওরকম বর আমি চাই না।"

"চাই না বললেই তো আর হবে না—ওকেই বিয়ে করতে হবে। নইলে তুই জব্দ হবি না।—ও প্রত্যেকবার ক্লাসে ফার্ষ্ট হয় জানিস ?"

"হোগ্ গে। ঐটুকু ছেলেকে আমি বিয়ে করব না।"

"আ গেল ! তোর কি এক্ষুণি বিয়ে হচ্ছে নাকি ? তোরা বড় হবি, তখন বিয়ে হবে।"

বিল্লু দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"ওকে আমি বড় হয়েও বিয়ে করব না। ও রকম বর আমার একটুও পছন্দ হয় না।"

বিল্লুর পাকা কথায় সকলেই অভ্যস্ত ছিল, অনিলা জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে তোমার কি রকম পছন্দ শুনি ?"

বিল্লু তৎক্ষণাৎ বলিল,—"কেন, জামাইবাবুর মত—ঐরকম লম্বা ফর্সা—চোখে চশমা।"

তাহার পিঠে একটা চড় মারিয়া অনিলা বলিল,—"ও ! লোকটিকে বড্ডই মনে ধরেছে দেখছি ! আচ্ছা দাঁড়াও, তাঁকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, তিনি এসে তোমাকে নিয়ে যান,—তুমিই গিয়ে তাঁর কাছে থাকো। আমি না হয় এখানেই পড়ে থাকব। সতীনের ঘর করা আমার পোষাবে না। তাও যেমন তেমন সতীন নয়—তোমার মত সতীন—"

পরিহাসচ্ছলে উক্ত হইলেও আসলে অনিলার কথাটা সত্য। সুন্দরী কন্যা দেখিলেই পুত্রবতী বাঙ্গালী-গৃহিণীর তাহাকে পুত্রবধূ

করিবার ইচ্ছা হয়—অনুরূপের মাতারও তাহা হইয়াছিল। দুই পরিবারে বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়া যাইবার পথ অনুরূপের মা বিল্লুদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়া একদিন বলিয়াছিলেন,—"বিল্লুর মত একটি মেয়ে পাই —আমার বৌ করি।"

বিল্লুর মা উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"বিল্লুব মত দরকার কি ভাই,—বিল্লুকেই নাও না!"

সেই অবধি দুই গৃহিণীর মধ্যে বেয়ান সম্পর্ক পাতানো হইয়া গিয়াছিল; যদিও কর্ত্তারা এই মেয়েলি ব্যাপার শুনিয়া নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করিয়া বলিয়াছিলেন,—একেই বলে গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল! মেয়ের বয়স আট বছর, ছেলের পনেরো—এরি মধ্যে বিয়ের কথা! আরে, বড় হোক, বেঁচে থাক, তার পর দেখা যাবে। সাধে কি আর মেয়েদের দশহাত কাপড়ে—"

অনুরূপও হাসিঠাট্টার সূত্রে বৌদিদিদের কাছে কথাটা শুনিয়াছিল। উত্তরে সে মনে মনে প্রকাণ্ড একটা "হুঁ" বলিয়াছিল। বিল্লুকে বিবাহ করার চেয়ে এক লক্ষ মাছি, মশা, বোলতা ও কাঠ-পিঁপড়েকে বিবাহ করা যে ঢের বেশী বুদ্ধিমানের কাজ এ কথা সে প্রকাশ করিয়া না বলিলেও তাহার মনের ভাব কাহারও নিকট অগোচর ছিল না।

তারপর একদিন হঠাৎ কি কারণে বেহারীবাবু বদ্‌লী হইয়া অন্য জেলায় চলিয়া গেলেন। বিজয় ও অনুরূপ কিছুদিন সজোরে পত্রবিনিময় চালাইল। কিন্তু দূরত্বের প্রভাবে ক্রমশঃ অনুরাগের বন্ধন শিথিল হইয়া গেল। উভয় পরিবারও ক্রমে পরস্পরকে প্রায় ভুলিয়া গেলেন। সে আজ প্রায় নয়-দশ বৎসরের কথা।

এই নয়-দশ বৎসরে বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এই প্রাচীনা

পৃথিবীর বয়স আরও নয়-দশ বৎসর বাড়িয়াছে। যাহারা কিশোর ছিল তাহারা যুবক হইয়া পড়িয়াছে, অনেক বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছে; ততোধিক শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—এবং আরও অনেক প্রকার বিচিত্র দার্শনিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।

বেহারীবাবু জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া পুরাতন সহরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অনুরূপ এখানকার পড়া শেষ করিয়া বিলাত গিয়াছিল, সেখান হইতে কি একটা পাশ করিয়া রেলের কভেনাণ্টেড চাকরী লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। উপস্থিত বাড়ীতেই আছে, মাসখানেকের মধ্যে টণ্ডুলার অফিসে যোগ দিতে হইবে। তাহার চুল এখনও খোঁচা খোঁচাই আছে বটে, কিন্তু ততটা নহে; কাণ দুইটিও বোধ করি শরীরের অনুপাতে বাড়ে নাই বলিয়া এখন আর তত বড় দেখায় না। ওদিকে সুনীলা ওরফে বিল্লুর বয়স এখন সতের বৎসর এবং তাহার মত ফাজিল, চপল, হৃদয়হীনা যুবতী—

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কিন্তু বেহারীবাবুর পারিবারিক জীবনে। যত দিন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ততদিন তিনি সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মতই পুরাতন প্রথায় জীবন কাটাইতেছিলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াই হঠাৎ পুরাদস্তুর সাহেব বনিয়া গিয়াছেন। আগে কেবল তাঁহার অফিস-রুম ছিল, এখন উপরন্তু ড্রয়িং-রুম হইয়াছে। মৈথিলী পাচক নির্ব্বাসিত হইয়া বাবুর্চ্চি নিযুক্ত হইয়াছে—টেবিলে বসিয়া সপরিবারে খানা ভোজন করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-গৃহিণী বেড়াইতে বাহির হইলে কোঁচান শাড়ী ও হাই-হিল্ জুতা পরেন। পর্দ্দা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কন্যা বিল্লু ম্যাট্রিক পাশ করিয়া উপস্থিত টেনিস ও বৃজ্ খেলিতেছে। বিজয় একটি ব্রাহ্ম মেয়েকে বিবাহ করিয়া বাপের সহিত পৃথক হইয়া স্বাধীনভাবে পুরুলিয়ায় ওকালতি করিতেছে।

ছুটীছাটায় সস্ত্রীক বাপের কাছে আসে, দুই চার দিন থাকিয়া আবার সস্ত্রীক চলিয়া যায়।

অনুরূপ বিলাত হইতে বাড়ী ফিরিবার দিন পাঁচ ছয় পরে তাহার মা বলিলেন,—"ওরে, বেহারীবাবুকে মনে আছে তো?—তোর বন্ধু বিজয়ের বাবা? তিনি যে জেলার কর্ত্তা হয়ে এসেছেন।"

তিন বৎসর পরে বাড়ী ফিরিয়া এ কয়দিন অনুরূপ পারিবারিক চক্রের বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার অবকাশ পায় নাই, কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তাই নাকি? কদ্দিন এসেছেন?"

"এই তো মাস দুই হবে।"

"তোমাদের সঙ্গে দেখাশুনো হয়েছে?"

"হাঁ, আমরা একদিন গিয়েছিলুম। যদিও এখন ওঁরা পুরোপুরি সাহেব হয়ে গেছেন, তবু আমাদের খুব আদর-যত্ন করলেন। এখনও আগেকার কথা ভোলেননি—তোর একবার যাওয়া উচিত।"

"বেশ তো, যাব। বিজয় কোথায়? এখানেই আছে নাকি?"

"না, সে তো পুরুলিয়ায় ওকালতি করছে।"

অনুরূপ হঠাৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আর বিল্লু? তার বোধ হয় বিয়ে হয়ে গেছে—না?"

"কৈ আর হয়েছে। এখন কি আর তাঁরা তার বিয়ে দেবেন? মেয়ের যে মোটে সতের বছর বয়স।" বলিয়া মা-ও মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

সেই দিনই বৈকালে অনুরূপ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাংলায় দেখা করিতে গেল। বাংলার সামনে একটা শান্-বাঁধান চাতাল ছিল, সেখানে বসিয়া বেহারীবাবু সস্ত্রীক সকন্যা চা-পান করিতেছিলেন। অনুরূপ সেখানে গিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইল।

বেহারীবাবু আরাম-কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া শুইয়াছিলেন, বিস্মিতভাবে ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। গৃহিণী অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া কাপড়টা মাথায় তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; বিল্লু বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া থাকিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল,—"নাকুদা! মা চিনতে পারছ না? দাদার বন্ধু, নাকুদা—মনে নেই?" বলিয়া আবার সেই নিতান্ত পরিচিত, কৈশোরের বহু নির্য্যাতনের স্মৃতি-অনুবিদ্ধ হাসি হাসিল।

"ওমা, তাই তো! চিনতে পারিনি—কতদিন পরে দেখলুম! এস বাবা। এই সে দিন বিজয় তোমার কথা বলছিল।—"

"By Jove! Young man, you have grown out of all recognition! Well! Well! Very glad to see you! Sit down! Sit down!"

অনুরূপ একটি চেয়ার টানিয়া বসিল। বিল্লু এক পেয়ালা চা ঢালিয়া তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল,—"নাকুদা, চা খাও।" তাহার ঠোঁটের কোণে একটু চাপা হাসি। অনুরূপ সচকিত হইয়া ভাবিল, সে কি এখানে আসিয়াই হাস্যকর কিছু করিয়া ফেলিয়াছে? নিজের কথা-বার্ত্তার উপর একটা কড়া পাহারা বসিয়া গেল।

নানা রকম কথা হইতে লাগিল; অনুরূপ বিলাতে গিয়া কোথায় ছিল, কি পাশ করিয়াছে, কোথায় চাকরী পাইল; বেহারীবাবু কতদিন ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, কোন্ কোন্ জেলা ঘুরিয়াছেন, কমিশনর সাহেব তাঁহার নামে সরকারের কাছে কি কি প্রশংসাসূচক ডি. ও. দিয়াছেন,—এই সব আলোচনার মধ্যে অনুরূপের মনটা কিন্তু বিল্লুর দিকেই সতর্ক হইয়া রহিল। দুই একবার বিল্লুর মুখের উপর চোখ পড়াতে দেখিল, সে তাহারি দিকে তাকাইয়া আছে ও পূর্ব্ববৎ মুখ টিপিয়া টিপিয়া

হাসিতেছে। যেন সে একটা ভারী হাস্যোদ্দীপক জীব,—তাহাকে দেখিলে কিছুতেই না হাসিয়া থাকা যায় না।

অনুরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময় অন্য কথার মাঝখানে বিল্লু বলিয়া উঠিল,—"মা, দেখেছ, নাকুদার চুল আর আগেকার মতন খাড়া খাড়া নেই—একটু নরম হয়েছে। আচ্ছা নাকুদা, তুমি ছেলেবেলার মত এখনও তেমনিই বোকা আছ? না বুদ্ধি বেড়েছে?"

অনুরূপ হাসিবার মত মুখ করিয়া বলিল,—"কি জানি। তোমাব কি মনে হয়?"

"এখনই কি বলা যায়? আরও দু'দিন দেখি।"

"তুই চুপ কর, বিল্লু। আমাদের কি কথা হচ্ছিল।" এইভাবে কন্যাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া গৃহিণী আবার ব্যাহত প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।

ঘণ্টা দেড়েক পরে অনুরূপ যখন বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন বিল্লু ঠোঁটের একটা সহাস্য ভঙ্গিমা করিয়া বলিল,—"নাকুদা, কাল আবার আসবে তো?"

অনুরূপ তাহার দিকে ফিরিয়া কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসুভাবে তাকাইয়া রহিল, কথাটার মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন পরিহাস আছে কিনা, তাহাই যেন নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিল; তারপর বলিল,—"আসব বৈ কি! যে ক'দিন আছি, রোজই আস্‌ব।"

অনুরূপ বাড়ী ফিরিবার পথে ভাবিতে লাগিল, তাহার প্রতি বিল্লুর মনের ভাবটা কি?—বিদ্রূপ? উপহাস? তাচ্ছীল্য?

কিন্তু কেন? ছেলেবেলায় বিল্লু তাহাকেই বিশেষ করিয়া নিজের

উৎপাত ও নিষ্ঠুরতার লক্ষ্যবস্তু করিয়া লইয়াছিল,—এখনও কি তাহার সে ভাব যায় নাই? কিম্বা সকলের সঙ্গেই সে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে?

সব চেয়ে অনুরূপকে বিঁধিয়াছিল বারবার ঐ "নাকুদা" সম্বোধনটা; যেন ঐ নামটা কিরূপ হাস্যকর তাহাই বিল্লু পুনঃ পুনঃ খোঁচা দিয়া দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সত্য বটে, নামটি শ্রুতিসুখকর নয়, কিন্তু তাই বলিয়া সেও কি উপহাসের পাত্র?

অনুরূপ ঈষৎ তিক্ত-মনে ভাবিল, আমাদের মেয়েরা একটু লেখাপড়া শিখিলেই মনে করে, কেহ তাহাদের সহিত কথা কহিবার সমকক্ষ নহে।

কিন্তু—বিল্লু কি অপরূপ সুন্দরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দিকে বেশীক্ষণ তাকাইতে যেন ভয় করে!—অথচ ইহাকেই সে একদিন কিল মারিয়াছে, চড় মারিয়াছে, কাণ ধরিয়া টানিয়া দিয়াছে, বাঁদরী, পোড়ারমুখী বলিয়াছে—

পাঠক নিশ্চয় এইখানে বিল্লুর একটি রূপ বর্ণনার জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইবে। আমি ধর্ম্মভীরু লোক, রূপ বর্ণনা দিব না, পরের ভাল জিনিষের প্রতি লুব্ধতা সঞ্চার করিয়া নরকে যাইতে পারিব না। আমি শুধু দু'ছত্রে তাহার আজিকার বেশভূষার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দিব, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। গায়ে তাহার ছিল গাঢ় সবুজ রঙের হাতকাটা ব্লাউজ, পরিধানে ছিল ঐ রঙেরই সিল্কের শাড়ী, পায়ে ছিল লাল বনাতের স্লিপার, চুলগুলি কি ভাবে জড়ান ছিল তাহার শিল্পরহস্য আমি ভেদ করিতে পারি নাই; সুতরাং বলিতে পারিলাম না। অলঙ্কার তাহার গায়ে ছিল না বলিলেই হয়—কেবল দু'গাছি সরু সোণার রুলি সুগোল

হাতে যেন চাপিয়া বসিয়া গিয়াছিল, আর গলায় ক্ষীণ একটি হার—তাহার নিম্নপ্রান্তে একটি হীরার লকেট—

আর এই সব বেশভূষা যে তরুণ তনুটিকে আশ্রয় করিয়া ছিল—

ঐ রে! আর একটু হইলেই আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলাম আর কি!

সে-রাত্রিতে বেহারীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে কথা হইল। গৃহিণী বলিলেন,—"অনুরূপের সঙ্গে বিল্লুর বিয়ে হলে মন্দ হয় না। আগেও তো একবার সম্বন্ধ হয়েছিল।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"বেশ তো, ওরা আসুক না আমার কাছে, প্রস্তাব করুক"—

"কিন্তু তা কি ওরা করবে! হাজার হোক ওরা বর পক্ষ। আমাদের দেশে যে উল্‌টো নিয়ম, মেয়ের বাপকেই ছুটোছুটি করতে হয়।"

"কিন্তু তাই বলে আমি তো আর উপযাচক হয়ে যেতে পারি না। বুঝ্‌লে না?"

গৃহিণী বুঝিলেন, হাকিমি মর্য্যাদায় বাধে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"দেখা যাক, আরও দুইদিন আসা যাওয়া করুক। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত নিজেই—বিলেত ফেরত তো।"

কর্ত্তা বলিলেন—"সে হলে তো কোনও গোলই থাকে না। তার উপর আর একটা কথা আছে। বিল্লুর পছন্দ অপছন্দ জানা দরকার। ও আবার যে রকম মেয়ে! মনে আছে তো, হাজারিবাগের সেই মুন্‌সেফ্‌ ছোকরা! তাকে তো হেসেই উড়িয়ে দিলে, যেন সে মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়। The heartless little minx!" বলিয়া সস্নেহে হাসিতে লাগিলেন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা অনুরূপ ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে উপস্থিত হইয়া শুনিল,—সাহেব ও মেমসাহেব একটা পার্টিতে গিয়াছেন,—কেবল

মিসিবাবা বাড়ীতে আছেন, উপস্থিত বাগানে বেড়াইতেছেন। অনুরূপ মিসিবাবার সন্ধানে প্রবেশ করিল।

একটা লোহার বেঞ্চির উপর বিল্লু পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল, তাহার বসিবার ভঙ্গী দেখিয়া অনুরূপের মনে হইল, সে কোলের উপর বই রাখিয়া পড়িতেছে। ছাঁটা ঘাসে ঢাকা লনের উপর দিয়া অনুরূপ নিঃশব্দে তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

বেঞ্চির কাছে পৌছিতে যখন আর হাত ছয়-সাত বাকী আছে, তখন বিল্লু হস্তস্থিত জিনিষটা মুখের কাছে তুলিযা চুম্বন করিল, তারপর সচকিতে কিছুক্ষণ ফিরিয়া চাহিযাই অনুরূপকে দেখিয়া তড়িদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এইরূপ অবস্থায় যে ধরা পড়ে, তাহার যেমন লজ্জার অবধি থাকে না, যে ধরিয়া ফেলে, সেও কম লজ্জা পায় না। অনুরূপ আরক্ত-মুখে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইযা রহিল।

যে লকেটে বিল্লু চুম্বন করিয়াছিল, তাহা তখনও তাহার হাতে ধরা ছিল, সেটা বন্ধ করিয়া বুকের কাপড়ের তলায় চাপা দিয়া বিল্লু শুষ্ক হাসিল, বলিল,—"চুপি চুপি একেবারে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছ যে!" তাহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ও অসন্তোষ সুস্পষ্ট।

অনুরূপ চুপি চুপি আসে নাই, পায়ের তলায় ঘাস ছিল বলিয়াই বিল্লু তাহার পদশব্দ শুনিতে পায় নাই। কিন্তু সে কৈফিয়ৎ দিতে যাওয়া বৃথা। হয়ত তাহার গলা-ঝাড়া দিয়া আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করা উচিত ছিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

বিল্লু বলিল,—"এখানেই বসবে, না, ভেতরে যাবে? মা-বাবা পার্টিতে গেছেন।"

অনুরূপ চেষ্টা করিয়া বলিল,—"যেখানে হয়—এখানেই বোসো।"

দুইজনে বেঞ্চিতে বসিল।

কিছুক্ষণ অস্বচ্ছন্দভাবে দুই একটা কথা হইল, তাহার পর বিল্লুর মুখের অপ্রসন্নতা কাটিযা গেল। সে হাসিযা বলিল,—"আচ্ছা নাকুদা, বিলেতে থাকতে তুমি ইংবেজ মেযেদের সঙ্গে মিশতে ?"

অনুরূপ সাবধানে বলিল,—"কিছু কিছু মিশেছি।"

বিল্লু জিজ্ঞাসা কবিল,—"তারা তোমায দেখে হাসত না ?"

অধর দংশন করিযা অনুরূপ বলিল,—"না। হাসবে কেন ?"

"অমনি" বলিযা বিল্লু নিজেই জোরে হাসিযা উঠিল।

ক্ষুব্ধভাবে কিয়ৎকাল চুপ কবিয়া থাকিযা অনুরূপ বলিল,—"আমাকে দেখলেই তোমাব হাসি পায—না ?"

"হ্যাঁ—বড্ড।"—বলিযা হাসিব বেগ রোধ করিতে না পাবিয়া বিল্লু মুখে রুমাল চাপিয়া ধবিল।

ধীরভাবে অনুরূপ জিজ্ঞাসা কবিল,—"কেন বলতো ?"

"কি জানি—তোমাকে দেখলেই—" কথাটা বিল্লু শেষ কবিতে পাবিল না।

মিনিট দুই শক্তভাবে বসিযা থাকিয়া অনুরূপ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"আচ্ছা, চললুম !"

রুমাল হইতে মুখ তুলিযা বিল্লু বলিল,—"বাগ হ'ল নাকি ?"

"না।"

কযেক পা যাইবাব পব বিল্লু তাহাকে ফিরিযা ডাকিল,—"নাকুদা, তুমি বৃজ্ খেলতে জান ?"

'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে দাঁড়াইয়া অনুরূপ বলিল,—"জানি সামান্য।"

বিল্লু বলিল,—"গোড়ায় সবাই ঐ কথাই বলে; তোমারও আবার বিনয় হচ্ছে নাকি ?—কাল সন্ধ্যের পর আমাদের বাড়ীতে একটা বৃজ্

পার্টি বসবার কথা আছে। খেলতে জানে এমন দু'জন লোক পাওয়া গেছে—কেবল একজনের অভাব হচ্ছে। তুমি আসতে পারবে ?"

উদাসভাবে অনুরূপ বলিল,—"যদি অভাব হয়—আসতে পারি। কিন্তু আমি ভাল খেলতে জানি না—"

হাসি গোপন করিয়া বিল্লু বলিল,—"এসো তাহ'লে। ঠিক সাতটার সময় !"

রাত্রিতে ঘুমাইয়া অনুরূপ স্বপ্ন দেখিল,—বিল্লু পিছন হইতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের সুরে বলিতেছে—"নাকুদা, আমায় দু'টো ফুল তুলে দেবে ভাই ?"

অনুরূপ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—আট বছরের বিল্লু নহে, সতেরো বছরের বিল্লু। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই—ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

এমন বিশ্রীভাবে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় কেন, কেহ বলিতে পারেন ?

পরদিন সন্ধ্যায় অনুরূপ যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল, দুই জন ভদ্রলোক হাজির আছেন। তাঁহাদের সহিত পরিচয় হইল,—দুই জনেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বয়সে তরুণ, বেশ সুপুরুষ। এক জনের নাম সমরেশ, অন্যের নাম সুধাংশু। বিল্লু পরিচয় করিয়া দিতে গিয়া বলিল,—"ইনি আমার দাদার ছেলেবেলার বন্ধু অনুরূপবাবু,—ওঁর একটা ডাক নাম আছে, কিন্তু সে নামটা আর শুনে কাজ নেই।"—বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

অনুরূপ লক্ষ্য করিল, এই দুইজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে বিল্লুর ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। তাহাদের দেখিয়া সে হাসিতেছে না, কথার মধ্যে তীক্ষ্ণ কাঁটার খোঁচা নাই। বেশ সহজ সম্ভ্রমপূর্ণ বন্ধুত্বের ভাব।

তাস খেলিতে বসিয়া বিল্লু অনুরূপের খেঁড়ী হইল। কিন্তু তবু খেলা

জমিল না। খেলিতে খেলিতে অনুরূপ কেবলই ভাবিতে লাগিল, এই দু'জনের মধ্যে কাহার ছবি বিল্লুর বুকের মধ্যে লকেটের ভিতর লুকানো আছে? কে তিনি? সুধাংশু না সমরেশ?

এইরূপ প্রশ্নসঙ্কুল মন লইয়া ভাল বৃজ্ খেলা চলে না। আধ ঘণ্টা পরে বিল্লু তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—"নাঃ নাকুদা, তুমি একেবারে কিছু খেলতে জান না।—আসুন, তার চেয়ে অন্য কিছু করা যাক।"

অনুরূপ আরক্ত-কর্ণমূলে বলিল,—আমি তো বলেছিলুম, আমি ভাল জানি না—"

তাহার কথার উত্তর না দিয়া বিল্লু বলিল,—"সুধাংশুবাবু, আপনি তো চমৎকার গাইতে পারেন। চলুন, ও ঘরে অর্গান আছে।"

* * * *

রসশাস্ত্রের বড় বড় পণ্ডিতরা বলিয়াছেন, করুণ রস বেশী ফেনাইতে নাই; নিতান্তই যদি জবাই করিবার দরকার হয়, তবে চটপট সে কাজ সারিয়া ফেলাই বিধি। সুতরাং এই পতঙ্গ ও দীপশিখার উপাখ্যান টানিয়া দীর্ঘ করিয়া আর শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিব না।

মোট কথা, অগ্নিশিখার সংস্পর্শে পতঙ্গের পাখা পুড়িয়া গেল, গায়েও সর্ব্বত্র ফোস্কা পড়িল। কিন্তু তবু সে পলাইতে পারিল না এবং মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিল না—"ওগো দীপ্তিময়ী শিখা, আমি তোমাকে চাই, তুমি আমাকে নিঃশেষে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দাও।" সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিয়মিত শিখার কাছে আসিতে লাগিল এবং নীরবে পাখার খানিকটা পুড়াইয়া দহনক্লিষ্ট-দেহে ফিরিয়া যাইতে লাগিল।

এই ভাবে একমাস কাটিয়া গেল। অনুরূপের টুণ্ডলায় গিয়া অফিসে যোগ দিবার সময় উপস্থিত হইল।

বিদেশ যাত্রার আগের রাত্রিতে বেহারীবাবুর বাংলায় অনুরূপের নিমন্ত্রণ হইল—বিদায়-ভোজ। নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার—আর কেহ নিমন্ত্রিত হয় নাই, শুধু অনুরূপ।

সন্ধ্যার পর হইতে ড্রয়িং-রূমে বসিয়া চারি জনে অলসভাবে গল্প করিয়া শেষে আহার করিতে গেলেন। তারপর প্রায় নীরবে ডিনার শেষ করিয়া ড্রয়িং-রুমে আসিয়া বসিলেন। অনুষ্ঠানটার গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেমন যেন প্রাণসঞ্চার হইল না, কোন্ অজ্ঞাত কারণে উহা কুণ্ঠিত ও কৃত্রিম হইয়া রহিল।

আহারাদি শেষ হইবার পরই বিল্লু উঠিয়া গিয়াছিল, অনুরূপকে একটা বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া যাওয়াও প্রয়োজন মনে করে নাই। তাহার এই অবহেলা তাহার মা বাবাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই রাত্রি দশটার সময় অনুরূপ যখন তাঁহাদের পদধূলি লইয়া বিদায় চাহিল, তখন তাহাকে যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহিণী একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন,—"বিল্লুর আজ শরীরটা ভাল নেই, সকাল থেকেই বলছিল। বোধ হয় শুয়ে পড়েছে।"

"থাক্, তাকে আর বিরক্ত করে কাজ নেই।"

অনুরূপ বাহির হইয়া পড়িল। চন্দ্রহীন রাত্রি—বোধ হয় অমাবস্যা। বাড়ীর সদর হইতে কম্পাউণ্ডের ফটক প্রায় একশ' গজ দূরে। অন্ধকারে পরিচিত পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে অনুরূপ ভাবিতে লাগিল,—এই এক মাস ধরিয়া কি উৎকট পাগলামিই না সে করিয়াছে! বিল্লু আর কাহাকেও ভালবাসে (বোধ হয় তিনি সুধাংশুবাবু), তাহা স্পষ্ট বুঝিয়াও নিজেকে এমন ভাবে খেলো করিবার কি দরকার ছিল? উঠিতে

বসিতে বিল্লু তাহাকে বিদ্রূপ করিয়াছে, অন্যের সম্মুখে হাস্যাস্পদ করিয়াছে, সে যে অতিশয় কৃপার পাত্র, তাহা বুঝাইয়া দিতে ত্রুটি করে নাই। তবু সে নির্লজ্জ মূঢ়ের মত লাগিয়াছিল কোন্ দুর্দ্দৈবের প্ররোচনায়? ভাগ্যে তাহার মনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই, নহিলে আরও কত বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত, কে জানে? কিন্তু যাক্, আজ এই হাস্যকর অভিনয়ের সমাপ্তি হইয়াছে, প্রহসনের শেষ দৃশ্যে যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে। অভিনয়কালে দর্শকরা আসিয়াছিল বটে, কিন্তু অভিনেতার মনে সুখ ছিল না। এখন সুখ না হো'ক অন্ততঃ সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

ফটক খুলিবার জন্য হাত বাড়াইতেই কাহার হাত হাতে ঠেকিয়া গেল, অনুরূপ চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"কে?"

"নাকুদা নাকি? যাচ্ছ?"—বিল্লুর কণ্ঠস্বর।

অনুরূপ হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। এতটা স্বচ্ছন্দ বেপরোয়া ভাব সে অনেক দিন অনুভব করে নাই, যেন মস্ত একটা সংশয়ের বোঝা বুক হইতে নামিয়া গিয়াছে, এমনি ভাবে বলিল,—"হ্যাঁ ভাই, চললুম। কাল বিকেলেই রওনা হতে হবে, কাজেই এ যাত্রা আর বোধ হয় তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। ভালই হল, আমি ত ভেবেছিলুম তুমি শুয়ে পড়েছ—"

"না—আমি রোজ এই সময় একটু বেড়াই।"

এতক্ষণে অনুরূপের ঠাহর হইল যে বিল্লু ফটকে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে,—অন্ধকারে কৃষ্ণতর একটা ছায়ামাত্র, মুখ চোখ কিছুই দেখা গেল না।

সে বলিল,—"কিন্তু আর বাইরে থাকা বোধ হয় ঠিক হবে না। রাত কম হয়নি। এ সময় একটু হিমও পড়ে।"

সে কথাব উত্তর না দিয়া বিল্লু জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কর্ম্মস্থল কোথায় বলছিলে? কাণপুরে?"

অন্ধকারে অনুরূপ হাসিল,—"না—তবে কাছাকাছি বটে। টুণ্ডলায়।"

"ও"—কিয়ৎকাল দুজনেই নীরব।

সহসা অনুরূপ তরল কণ্ঠে বলিল,—"আমি চলে গেলে কিছুদিন তোমার ভারী কষ্ট হবে—না?"

"কষ্ট হবে? কেন?"—তাহার উত্থিতভ্রূ ঈষৎ বিস্ময়ের ভঙ্গী দেখা না গেলেও বুঝা গেল।

"এমন একটা target—একটা সঙ—আর কি সহজে খুঁজে পাবে? যাকে দেখলেই হাসি পায়, এমন লোক ত পৃথিবীতে বেশী নেই কি না, তাই ভাবছি প্রথম প্রথম হয় ত একটু কষ্ট হবে।" তাহার কণ্ঠস্বরে গ্লানির লেশমাত্র নাই।

কিছুক্ষণ বিল্লু জবাব দিল না, তারপর বলিল,—"তোমাকে আজ ভাবী খুসী মনে হচ্ছে।"

"খুসী?" অনুরূপ অল্পকাল আত্মানুসন্ধান করিয়া বলিল,—"না, ঠিক খুসী নয়—তবে মনটা একটু হাল্কা বোধ হচ্ছে।—কাজকর্ম্ম নেই চুপ করে বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না—সেই জন্যই বোধ হয়—"

বিল্লুর হাসি শুনা গেল,—"তুমি আজকাল ভারী কাজের লোক হয়ে উঠেছ—না?"

"হইনি এখনও—তবে পাকেচক্রে পড়ে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত হয়ে পড়্তে পারি।"

"তুমি কোনও কালে কাজের লোক হতে পারবে না।"

"পারব না? কেন বল দেখি?"

"তুমি একেবারে—একেবারে অপদার্থ।"—সঙ্গে সঙ্গে চাপা হাসির শব্দ।

কিছুক্ষণ সমস্ত নিস্তব্ধ,—যেন অন্ধকারে দুইজন মুখোমুখি দাঁড়াইয়া নাই। পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল।

অন্ধকারে একটা গভীর নিঃশ্বাস পড়িল। অনুরূপ বলিল,—"তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে, কে জানে! হয় ত আর কখনও—আচ্ছা বিল্লু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? কিছু মনে করো না, আমি রাগ বা অভিমান করে বলছি না, শুধু একটা কৌতূহল হচ্ছে। তুমি যে আমাকে কথায় কথায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে, লোকের কাছে হাস্যাস্পদ করতে—আমার কি সত্যিই কোনও দোষ ছিল? আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি, তাই জান্‌তে চাইছি। কি জানি, হয় ত না জেনে প্রতিপদেই এমন নির্ব্বুদ্ধিতা কিম্বা অসভ্যতা করে ফেলেছি—"

বিল্লু আবার হাসিয়া উঠিল, তাহার চাপা অথচ দুর্নিবার হাসির ঢেউ অনুরূপের কথাগুলি ভাসাইয়া লইয়া গেল।

অত্যন্ত আহতস্বরে অনুরূপ বলিল,—"বিল্লু! হাসি নয়। সত্যি বল আমি কী অন্যায় করেছিলুম—"

"চুপ কর। আমি আর পারছি না—তোমার মত বোকা—"

"বোকা! তাই হবে বোধ হয়।"—আর একটা নিঃশ্বাস পড়িল, "আচ্ছা চললুম।"

অনুরূপ ফটক খুলিল।

"যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ" অনুরূপ ফটকের বাহির হইল।

"—আচ্ছা—এস"—আবার সেই হাসি।

ঠিক এই সময়—উল্কার আলো!

অন্ধকার আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত আলোর দাগ কাটিয়া একটা উল্কাপিণ্ড ফাটিয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাহারই উজ্জ্বল নীল প্রভায় অনুরূপ দেখিল,—বিল্লুর চোখের জলে মুখ ভিজিয়া গিয়াছে এবং সে দু'হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া—

যাহা অনুরূপ চাপা হাসি বলিয়া ভুল করিয়াছিল, তাহা অদম্য রোদনের উচ্ছ্বাস!

*　　*　　*　　*

আবার অন্ধকার।

"বিল্লু!"

"কি?" স্বর ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ।

"আমি বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলুম—তুমি আর কাউকে—" বিল্লুর নিকট হইতে কোন জবাব আসিল না।

—"তোমার লকেটে—" অনুরূপের এ কথাটাও অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরে বিল্লুর হাত অনুরূপের হাতে ঠেকিল, বিল্লু একটা ঈষদুষ্ণ ক্ষুদ্র বস্তু তাহার করতলে রাখিয়া হাত টানিয়া লইল। অনুরূপ অনুভব করিয়া বুঝিল—লকেট।

বলিল,—"এ কি হবে?"

"নাও। ওর মধ্যে একটা মুণ্ডু আছে, চিনতে পার কি না দেখো।"

"বিল্লু!"

উত্তর নাই। অনুরূপ আবার ডাকিল,—"বিল্লু!"

বিল্লুর সাড়া পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, বিল্লুর মনে যদি ইহাই ছিল, তবে সে এমন ব্যবহার করিল কেন? ইহার উত্তর বোধ করি বিল্লু নিজেও দিতে পারিবে না। তাই গোড়ায় বলিয়াছিলাম, এ গল্পের নাম হওয়া উচিত ছিল—স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং—কিম্বা—

২৩ চৈত্র ১৩৩৯

মায়ামৃগ

১

এই কাহিনীটি আমার নিজস্ব নয়; অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে ধূম বিশেষ সহযোগে ইহার উৎপত্তি হয় নাই। তাই সর্ব্বাগ্রে নিজের সমস্ত দাবী-দাওয়া তুলিয়া লওয়া উচিত বিবেচনা করিতেছি।

যে হঠাৎ-লব্ধ বন্ধুটির মুখে এ কাহিনী শুনিয়াছিলাম, তিনি নিজের চারিধারে এমন একটি দুর্ভেদ্য রহস্যের জাল রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার গল্পকে ছাপাইয়া তাঁহার নিজের সম্বন্ধেই একটা প্রবল কৌতূহল আমার মনে বসিয়া গিয়াছে। মাত্র দুইবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তার পর তিনি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। জানি না, এখন তিনি কোথায়। হয়ত শ্যামদেশের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে দুরারোহ গিরিসঙ্কটের মধ্যে সেই অদ্ভুত মায়ামৃগের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। তবে নিশ্চয় ভাবে বলিতে পারি না; শুনিয়াছি বড় বড় শিকারীদের কথা একটু লবণ সহযোগে গ্রহণ করিতে হয়।

এই কাহিনী আমি যেমনটি শুনিয়াছিলাম ঠিক তেমনটিই লিপিবদ্ধ করিব। কয়েক স্থানে বুঝিতে পারি নাই, সুতরাং কাহাকেও বুঝাইতে পারিব না। ভরসা শুধু এই, যাঁহারা ইহা পড়িবেন তাঁহারা সকলেই আমা-অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান, বুঝিবার মত ইঙ্গিত কিছু থাকিলে তাঁহারা নিশ্চয় বুঝিয়া লইবেন, এবং কাহিনীটি যদি নিছক আষাঢ়ে গল্পই

হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদের ধরিয়া ফেলিতে বিলম্ব হইবে না। আমি কেবল মাছি-মারা ভাবে অবিকল পুনরাবৃত্তি করিয়া খালাস।

* * *

গত শীতকালে একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ খেয়াল হইল পক্ষিশিকারে বাহির হইব। বড়দিনের ছুটি যাইতেছে, শীতও বেশ কন্‌কনে। বৎসরের মধ্যে ঠিক এই সময়টাতে, কেন জানি না, পক্ষিজাতির উপর নিদারুণ জিঘাংসা জাগিয়া উঠে।

সঙ্গী পাইলাম না; একাই বাইসিকেল আরোহণে বাহির হইয়া পড়িলাম। শহরের চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বন আছে, শস্যপুষ্ট নানা জাতীয় পক্ষী এই সময় তাহাতে ভীড় করিয়া থাকে।

সারা দুপুরটা জঙ্গলের মধ্যে মন্দ কাটিল না। কয়েকটা পাখীও জোগাড় হইল। কিন্তু অপরাহ্ণে বাড়ী ফিরিবার কথা যখন স্মরণ হইল তখন দেখি, অজ্ঞাতে শিকারের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি—প্রায় বারো মাইল। শরীরও বেশ ক্লান্ত হইয়াছে এবং পাকস্থলী অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাবে নিজের রিক্ততা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শীঘ্র বাড়ী পৌঁছিতে হইবে। বন হইতে পাকা সড়কে উঠিয়া গৃহাভিমুখে বাইসিকেল চালাইলাম। গৈরিক ধূলায় সমাচ্ছন্ন পথ, দু-ধারে কখনও অড়রের ঘন-পল্লব ক্ষেত, কখনও নিসিন্দের ঝাড়; কখনও বা ধূম-চন্দ্রাতপে ঢাকা ক্ষুদ্র দু-একটা বস্তি।

যথাসম্ভব দ্রুতবেগে চলিয়াছি; আলো থাকিতে থাকিতে বাড়ী পৌঁছিতে পারিলেই ভাল; কারণ বাইসিকেলের বাতি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

দিনের আলো ক্রমে নিবিয়া আসিতে লাগিল। গো-ক্ষুর ধূলায়

নাই। একটা তরুণ অশত্থগাছ সম্মুখের ছাদহীন দালানের ভিত্তি কাটাইয়া মাথা তুলিয়াছে এবং ভিতরে প্রবেশের পথ ঘন পল্লবে অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে।

বাড়ীখানা সত্তর-আশী বছর আগে হয়ত কোনও স্থানীয় জমিদারের বাসভবন ছিল, তার পর বহুকাল পরিত্যক্ত থাকিয়া প্রকৃতির প্রকোপে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ভিতরে বাসোপযোগী ঘর দু-এক খানা এখনও খাড়া থাকিতে পাবে, কিন্তু বাহির হইতে তাহা অনুমান করিবার উপায় নাই।

বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সঙ্গী বলিলেন, 'বাইসিকেল্ এইখানে রাখুন।'—বলিয়া ভিতরে প্রবেশের উপক্রম করিলেন।

আমি আর বিস্ময় চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'আপনি এই বাড়ীতে থাকেন?'

'হ্যাঁ। আসুন।'

তাঁহার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার বুঝাইয়া দিল যে অযথা কৌতূহল তিনি পছন্দ করেন না। আর প্রশ্ন করিলাম না, দেয়ালের গায়ে বাইসিকেল্ হেলাইয়া রাখিয়া তাঁহার অনুগামী হইলাম। তবু মনের মধ্যে নানা উত্তেজিত প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। বিহারের এক প্রান্তে শহর—লোকালয় হইতে বহুদূরে একটি ভাঙা বাড়ীর মধ্যে এই বাঙালী ভদ্রলোকটি কি করিতেছেন? কে ইনি! এই অজ্ঞাতবাসের অর্থ কি?

নানাপ্রকার ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। অভ্যন্তরের পথ কিন্তু অতিশয় কুটিল ও বিঘ্নসঙ্কুল। সদর দ্বারের অশত্থগাছ উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলাম একটা দেয়াল ধ্বসিয়া পড়িয়া সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছে; তাহাকে এড়াইয়া আরও

কিছুদূর যাইবার পর দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড শালের কড়ি বক্র-ভাবে প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইয়া মাঝখানে আগড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পদে পদে কাঁটাগাছ বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া ধরিতে লাগিল; যেন আমাদের ভিতরে যাইতে দিবার ইচ্ছা কাহারও নাই।

যা হোক, অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে এক দরজার সম্মুখে আসিয়া আমার সঙ্গী দাঁড়াইলেন। দেখিলাম দরজায় তালা লাগানো।

তালা খুলিয়া তিনি মরিচা-ধরা ভারী দরজা উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন, তারপর আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। অন্ধকার গহ্বরের মত ঘর দেখিয়া সহসা প্রবেশ করিতে ভয় হয়। কিন্তু যে চক্রব্যূহের এতটা পথ নিরাপত্তিতে আসিয়াছি, তাহার মুখ হইতে ফিরিব কি বলিয়া? বুকের ভিতর অজানা আশঙ্কায় দুরু দুরু করিয়া উঠিল—এই অজ্ঞাতকুলশীল সঙ্গীটি কেমন লোক? কোথায় আমাকে লইয়া চলিয়াছেন?

কণ্ঠের মধ্যে একটা কঠিন বস্তু গলাধঃকরণ করিয়া চৌকাঠ পার হইলাম। তিনিও ভিতরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। টর্চ্চের আলো একবার চারিদিকে ঘুরিয়া নিবিয়া গেল।

রুদ্ধশ্বাসে অনুভব করিলাম, তিনি আমার পাশ হইতে সরিয়া গিয়া কি একটা জিনিষ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। পরক্ষণেই দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া উঠিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল ল্যাম্পের আলোয় ঘর ভরিয়া গেল।

এতক্ষণে আমার আবছায়া সঙ্গীকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। মধ্যমাকৃতি লোকটি, রোগা কিংবা মোটা কোনটাই বলা চলে না, মুখের গড়নও নিতান্ত সাধারণ,—কেবল চোখের দৃষ্টি অতিশয় গভীর, মনে হয় যেন সে-দৃষ্টির নিকট হইতে কিছুই লুকান চলিবে না। চোয়ালের

হাড় দৃঢ় ও পরিপুষ্ট, গোঁফ-দাড়ি কামান—বয়স বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি। পরিধানে একটা চেক-কাটা রেশমের লুঙ্গি ও পাঁশুটে রঙের মোটা কোট-সোয়েটার। তাঁহার চেহারা ও বেশভূষা দেখিয়া সহসা তাঁহার জাতি নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে।

তাঁহার গম্ভীর সপ্রশ্ন চোখদুটি আমার মুখের উপর রাখিয়া অধরে একটু হাসির ভঙ্গিমা করিয়া তিনি বলিলেন,—'স্বাগত। বন্দুক রাখুন।'

বন্দুক কাঁধেই ঝোলান ছিল; পাখীর থলেটাও সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সেগুলা নামাইতে নামাইতে ঘরের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। ঘরের মাঝখানে একটা প্যাকিং বাক্সকে কাত করিয়া টেবিলে পরিণত করা হইয়াছে, তাহার উপর কেরোসিন ল্যাম্প রক্ষিত। ল্যাম্পের আলোয় দেখা গেল, ঘরটি মাঝারি আয়তনের, এক কোণে পুরুভাবে খড় পাতা রহিয়াছে, ইহাই বোধ হয় বর্ত্তমান গৃহস্বামীর শয্যা। ইহা ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাব নাই। ঘরের লবণ-জর্জ্জরিত দেওয়ালগুলি যেন আপনার নিরাভরণ দীনতার কথা স্মরণ করিয়াই ক্লেদ-সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বন্দুক দেয়ালে হেলাইয়া রাখিলে গৃহস্বামী বলিলেন,—'আপনার ওটা কি বন্দুক?

বলিলাম,—'সাধারণ শ্টু-গ্যান্। খাঁটি দেশী জিনিষ কিন্তু; এখানকারই তৈরী।'

তিনি আসিয়া বন্দুকটা হাতে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার বন্দুক-ধরার ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিলাম আগ্নেয়াস্ত্র-চালনায় তিনি অভ্যস্ত নন। বন্দুকের ঘাড় ভাঙ্গিয়া নলের ভিতর দিয়া দৃষ্টি চালাইয়া তিনি বলিলেন,—'মন্দ জিনিষ নয়ত। পঁচাত্তর গজ পর্য্যন্ত পরিষ্কার পাল্লা মারবে। একটু বেশী ভারী—তা ক্ষতি কি?—কই কি পাখী মেরেছেন দেখি?'

'তিনি নিজেই থলে আজাড় করিয়া পাখীগুলি বাহির করিলেন। তারপর আনন্দে বলিয়া উঠিলেন,—'বাঃ এ যে তিতির আর বন-পায়রা দেখছি। দুটো হারিয়ালও পেয়েছেন;—এদিকে অনেক হারিয়াল পাওয়া যায়—আমি দেখেছি।'

দেখিলাম অকৃত্রিম শিশুসুলভ আনন্দে তাঁহার মুখ ভরিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ আমাদের মাঝখানে যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবধান ছিল তাহা যেন অকস্মাৎ লুপ্ত হইয়া গেল।

পাখীগুলিকে সস্নেহে নাড়িয়া-চাড়িয়া অবশেষে তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, একটু লজ্জিত স্বরে বলিলেন,—'চায়ের আশ্বাস দিয়ে আপনাকে এনে কেবল পাখাই দেখছি। আসুন চায়ের ব্যবস্থা করি। আপনি বসুন; কিন্তু বসতে দেব কোথায়?—একটু অপেক্ষা করুন।' তিনি দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া পরক্ষণেই দুটি ছোট মজবুত-গোছের প্যাকিং কেস লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, একটিকে টেবিলের পাশে বসাইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া শয্যার দিকে গেলেন, সেখান হইতে একটা সাদা লোমশ আসন আনিয়া বাক্সের উপর বিছাইয়া দিয়া বলিলেন,—'এবার বসুন।'

শাদা আস্তরণটা আমার কৌতূহল আকৃষ্ট করিয়াছিল, সেটা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কোন জন্তুর চামড়া, ধবধবে সাদা রেশমের মত মোলায়েম দীর্ঘ লোমে ঢাকা চামড়াটি; দেখিলেই লোভ হয়। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কিসের চামড়া?'

তিনি বলিলেন,—'হরিণের।'

বিস্মিতভাবে বলিলাম,—'হরিণের! কিন্তু—সাদা হরিণ?'

তিনি একটু হাসিলেন,—'হাঁ—সাদা হরিণ।'

সাদা হরিণের কথা কোথাও শুনি নাই, কিন্তু, কে জানে, থাকিতেও

পারে। প্রশ্ন করিলাম,—'কোথায় পেলেন? উত্তরমেরুর হরিণ নাকি?'

তিনি মাথা নাড়িলেন,—'না, অতদূরের নয়, শ্যামদেশের। ওর একটা মজার ইতিহাস আছে।—কিন্তু আপনি বসুন, বলিয়া অতিথিসংকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দেখা গেল তাঁহার প্যাকিং বাক্সটি কেবল টেবিল নয়, তাঁহার ভাঁড়ারও বটে। তাহার ভিতর হইতে একটি ষ্টোভ বাহির করিয়া তিনি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চায়ের কৌটা, চিনির মোড়ক, জমানো দুধের টিন ও দুটি কলাই-করা মগ বাহির করিয়া পাশে রাখিলেন। তারপর একটি অ্যালুমিনিয়ামের ঘটিতে জল লইয়া ষ্টোভে চড়াইয়া দিলেন।

তাঁহার ক্ষিপ্র নিপুণ কার্য্যতৎপরতা দেখিতে দেখিতে আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, আপনি যে একজন পাকা শিকারী তা তো বুঝতে পারছি, তোমার নাম কি?'

তাঁহার প্রফুল্ল মুখ একটু গম্ভীর হইল, বলিলেন—'আমার নাম শুনে আপনার লাভ কি?'

'কিছুই না। তবু কৌতূহল হয় না কি?"

'তা বটে। মনে করুন আমার নাম—প্রমথেশ রুদ্র।'

বুঝিলাম, আসল নামটা বলিলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। তারপর সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনি একলা এই ভাঙা বাড়ীতে কেন রয়েছেন এ প্রশ্ন করাও ধৃষ্টতা হবে কি?'

তিনি উত্তর দিলেন না, যেন আমার প্রশ্ন শুনিতে পান নাই এমনি ভাবে ষ্টোভে পাম্প করিতে লাগিলেন; মনে হইল তাঁহার চোখের উপর একটা অদৃশ্য পর্দা নামিয়া আসিয়াছে।

ক্রমে চায়ের জল ষ্টোভের উপর ঝিঁঝিঁপোকার মত শব্দ করিতে আরম্ভ করিল।

তিনি সহজভাবে বলিলেন,—'চায়ের জলও গরম হয়ে এল। কিন্তু শুধু চা খাবেন? আমার ঘরে এমন কিছু নেই যা-দিয়ে অতিথিসেবা করতে পারি। কাল রাত্রে তৈরি খানকয়েক শুকনো রুটি আছে, কিন্তু সে বোধ হয় আপনার গলা দিয়ে নামবে না।'

আমি বলিলাম,—'ক্ষিদের সময় গলা দিয়ে নামে না এমন কঠিন বস্তু পৃথিবীতে কমই আছে। কিন্তু তা ছাড়াও ঐ পাখীগুলা তো রয়েছে! ওগুলার সৎকার করলে হয় না?'

'ওগুলা আপনি বাড়ী নিয়ে যাবেন না?'

'বাড়ী নিয়ে গিয়েও তো খেতেই হবে! তবে এখানে খেতে দোষ কি? পাখীগুলা একজন যথার্থ শিকারীর পেটে গিয়ে ধন্য হ'ত।'

তিনি হাসিলেন,—'মন্দ কথা নয়। পাখীর স্বাদ ভুলেই গেছি।' তাঁহার মুখে একটা বিচিত্র হাসি খেলিয়া গেল; যেন পাখীর স্বাদ ভুলিয়া যাওয়ার মধ্যে একটা মিষ্ট কৌতুক লুক্কায়িত আছে। হাসিটি আত্মগত; আমাকে দেখাইবার ইচ্ছা বোধ হয় তাঁহার ছিল না; তাই ক্ষণেক পরে সচকিত হইয়া বলিলেন,—'তাহলে ওগুলাকে ছাড়িয়ে ফেলা যাক—কি বলেন? নরম মাংস, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে।'

তিনি অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতার সহিত পাখী ছাড়াইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার পানে তাকাইয়া বসিয়া রহিলাম। সেই পুরাতন প্রশ্নই মনে জাগিতে লাগিল—কে ইনি? লোকচক্ষুর আড়ালে লুকাইয়া শুকনা রুটি খাইয়া জীবনযাপন করিতেছেন কেন?

এক সময় তিনি সহাস্যে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—'আজ একটু শীত আছে। চামড়াটা বেশ গরম মনে হচ্ছে তো?'

'চমৎকার! আচ্ছা, আপনি অনেক দেশ ঘুরেছেন—না?'

'হ্যাঁ।'

'প্রশ্ন করতে সাহস হয় না, তবে সম্ভবত শিকারের জন্যেই দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন?'

'তা বলতে পারেন।'

যিনি নিজের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে অপ্রসন্ন হইয়া উঠেন তাঁহার সহিত অন্য কথা বলাই ভাল। তাই ইচ্ছা করিয়া শিকারের আলোচনাই আরম্ভ করিলাম, বিশেষতঃ সাদা চামড়াটা সম্বন্ধে বেশ একটু কৌতূহলও জাগিয়াছিল।

বলিলাম,—'শ্যামদেশে সাদা হরিণ পাওয়া যায়? কিন্তু কোথাও পড়ি নি তো?'

তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন,—'না পড়বারই কথা। ও হরিণ আর কেউ চোখে দেখে নি। চোখে দেখার জিনিষ ও নয়।'

'কি রকম?'

'পৃথিবীতে যত রকম আশ্চর্য্য জীব আছে—ঐ হরিণ তার মধ্যে একটি। প্রকৃতির সৃষ্টিতে এর তুলনা নেই।'

'কি ব্যাপার বলুন তো? অবশ্য সাদা হরিণ খুবই অসাধারণ, কিন্তু—'

'আপনি কেবল সাদা চামড়াটা দেখছেন। আমি কিন্তু ওকে দেখেছি সম্পূর্ণ অন্য রূপে—অর্থাৎ দেখিনি বললেই হয়।'

'আপনি যে ধাঁধা লাগিয়ে দিলেন। কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিলেন,—'অদৃশ্য প্রাণীর কথা কখনও শুনেছেন?'

'অদৃশ্য প্রাণী! সে কি?'

'হ্যাঁ—যাদের চোখে দেখা যায় না, চোখের সামনে যারা মরীচিকার মত মিলিয়ে যায়। শ্যামদেশের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে দুর্ভেদ্য পাহাড়ে ঘেরা এক উপত্যকায় আমি তাদেব দেখেছি,—বিশ্বাস করছেন না? আমারও মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তখন ওই চামড়াটা স্পর্শ ক'রে দেখি।'

'বড় কৌতূহল হচ্ছে; সব কথা আমায় বলবেন কি?'

তিনি একটু খামখেয়ালি হাসি হাসিলেন, বলিলেন,—'বেশ;—চায়ের জল হয়ে গেছে, মাংসটা চড়িয়ে দিয়ে এই অদ্ভুত গল্প আবম্ভ কবা যাবে। সময় কাটাবার পক্ষে মন্দ হবে না।'



চায়ের পাত্র সম্মুখে লইয়া দু-জনে মুখোমুখি বসিলাম। এক চুমুক পান করিতেই মনে হইল শরীরের ভিতব দিয়া অত্যন্ত সুখকর উত্তাপের একটা প্রবাহ বহিয়া গেল।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেমন চা?'

বলিলাম,—'চা নয়—নির্জ্জলা অমৃত। এবার গল্প আরম্ভ করুন।'

তিনি কিছুক্ষণ শূন্যের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্ষু স্মৃতিচ্ছায়ায আবিষ্ট হইল। তিনি থামিয়া থামিয়া অসংলগ্ন ভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

'গত বছর এই সময়—কিছুদিন আগেই হবে; হ্যাঁ, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। আমি আর আমার এক বন্ধু পাকেচক্রে প'ড়ে বর্ম্মার জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলুম।

'বন্ধুটির নাম জঙ-বাহাদুর—নেপালী ক্ষত্রিয়। আমাদের লটবহরের মধ্যে ছিল দুটি কম্বল আর দুটি রাইফেল। হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে যাত্রা সুরু করতে হয়েছিল তাই বেশী কিছু সঙ্গে নিতে পারি নি।

'অফুরন্ত পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে পথঘাট সব গুলিয়ে গিয়েছিল। যেখানে মাসান্তে মানুষের মুখ দেখা যায় না, এবং শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করা বা শিকারী জন্তুর দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হওয়াই পা-চালানোর একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে স্থান-কাল ঠিক রাখা শক্ত। আমরা শুধু পূর্ব্বদিকটাকে সামনে রেখে আর-সব শ্রীভগবানের হাতে সমর্পণ ক'রে দিয়ে চলেছিলুম। কোথায় গিয়ে এ যাত্রা শেষ হবে তার কোন ঠিকানা ছিল না।

'একদিন একটা প্রকাণ্ড নদী বেতের ডোঙায় ক'রে পার হয়ে গেলুম। জানতেও পারলুম না যে বর্ম্মাকে পিছনে ফেলে আর এক রাজ্যে ঢুকে পড়েছি। জানতে অবশ্য পেরেছিলুম—কয়েক দিন পরে।

'মেকং নদীর নাম নিশ্চয় জানেন। সেই মেকং নদী আমরা পার হলুম এমন জায়গায় যেখানে তিনটি রাজ্যের সীমানা এসে মিশেছে—পশ্চিমে বর্ম্মা, দক্ষিণে শ্যামদেশ, আর পূর্ব্বে ফরাসী-শাসিত আনাম। এ সব খবর কিন্তু পার হবার সময় কিছুই জানতুম না।

'মেকং পার হয়ে আমরা নদীর ধার ঘেঁষে দক্ষিণ মুখে চললুম। এদিকে পাহাড় জঙ্গল ওরই মধ্যে কম, মাঝে মাঝে দুই-একটা গ্রাম আছে। শিকারও প্রচুর। খাদ্যের অভাব নেই। জঙ-বাহাদুর এ দেশের ভাষা কিছু কিছু বোঝে, তাই রাত্রিকালে গ্রামে কোন গৃহস্থের কুটীরে আশ্রয় নেবার সুবিধা হয়—দুর্জ্জয় শীতে মাথা রাখবার জায়গা পাই।

'বড় শহর বা গ্রাম আমরা যথাসাধ্য এড়িয়ে যেতুম। তবু একদিন ধরা প'ড়ে গেলুম। দুপুরবেলা দু-জনে একটা পাথুরে গিরিসঙ্কটের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ বাঁ-দিক থেকে কর্কশ আওয়াজে চমকে উঠে দেখি, একটা লোক পাথরের চাঙড়ের আড়ালে থেকে রাইফেল উঁচিয়ে আমাদের লক্ষ্য ক'রে আছে। দিশী লোক—নাক চ্যাপ্টা, থ্যাবড়া

মুখ কিন্তু তার পরিধানে সিপাহীর ইউনিফর্ম্ম ; গায়ে খাকি পোষাক, মাথায় জরির কাজ করা গোল টুপী, পায়ে পট্টি আর অ্যামুনিশন বুট।

'বুঝতে বাকী রইল না যে বিপদে পড়েছি। সিপাহী সেই অবস্থাতেই বাঁশী বাজালে ; দেখতে দেখতে আরও দু-জন এসে উপস্থিত হ'ল। তখন তারা আমাদের সামনে রেখে মার্চ্চ করিয়ে নিয়ে চলল।

'কাছেই তাদের ঘাঁটি। সেখানকার অফিসার আমাদের খানাতল্লাস করলেন, অনেক প্রশ্ন করলেন যার একটাও বুঝতে পারলুম না, তার পর বন্দুক আর টোটা বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়ে চার জন সিপাহীর জিম্মায় দিয়ে আমাদের রওনা ক'রে দিলেন।

'মাইল-তিনেক যাবার পর দেখলুম এক শহরে এসে পৌঁছেছি। নদীর ধারেই শহরটি—খুব বড় নয়, কিন্তু ছবির মত দেখতে।

'সিপাহীরা নদীর কিনারায় একটা বড় বাংলায় আমাদের নিয়ে হাজির করলে। এখানে শহরের সবচেয়ে বড় কর্ম্মচারী থাকেন।

'যথাসময়ে আমরা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম তিনি এক জন ফৌজী অফিসার—জাতিতে ফরাসী—বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, গায়ের রং বহুকাল গরম দেশে থেকে তামাটে হয়ে গেছে।

'তিনি ইংরেজী কিছু কিছু বলতে পারেন। আমার সঙ্গে প্রথমেই তাঁর খুব ভাব হয়ে গেল। ফরাসীদের মত এমন মিশুক জাত আর আমি দেখি নি, সাদা-কালোর প্রভেদ তাদের মনে নেই। এঁর নাম কাপ্তেন দু'বোয়া। অল্পকালের মধ্যেই তিনি আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ সুরু করে দিলেন। তাঁরই মুখে প্রথম জানতে পারলুম, আমরা আনাম দেশে এসে পড়েছি, নদীর ওপারে ঐ পর্ব্বত-বন্ধুর দেশটা শ্যামরাজ্য। মেকং নদী এই দুই রাজ্যের সীমান্ত রচনা ক'রে বয়ে গেছে।

'আমরা কোথা থেকে আসছি, কি উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি, এ সব প্রশ্নও তিনি করলেন। যথাসাধ্য সত্য উত্তর দিলুম। বললুম, প্রাচ্যদেশ পদব্রজে ভ্রমণ করবার অভিপ্রায়েই বৃটিশ রাজ্য থেকে বেরিয়েছি, পাস্‌পোর্ট নেওয়া যে দরকার তা জান্‌তুম না। তবে শিকার এবং দেশ-বিদেশ দেখা ছাড়া আমাদের কোন অসাধু উদ্দেশ্য নেই।

'নানাবিধ গল্প করতে করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এইবার কাপ্তেন দু'বোয়া ফরাসী শিষ্টতার চরম কর্‌লেন, আমাদের নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ জানালেন। শুধু তাই নয়, রাত্রে তাঁর বাড়ীতে আমাদের শয়নের ব্যবস্থা হ'ল। রাজপুরুষের এই অযাচিত সহৃদয়তা আমাদের পক্ষে যেমন অভাবনীয় তেমনই অস্বস্তিকর।

'রাত্রে আহারে ব'সে কাপ্তেন হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন,— আপনারা বৃটিশ ফৌজি-রাইফেল কোথায় পেলেন?

বললুম,—আর্মি ষ্টোর থেকে মাঝে মাঝে পুরণো বন্দুক বিক্রী হয়, তাই কিনেছি।

কাপ্তেন আর কিছু বললেন না।

'অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্পগুজব হ'ল। তার পর কাপ্তেন নিজে এসে আমাদের শোবার ঘরের দোর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। অনেক দিন পরে নরম বিছানায় শয়ন করলুম।

'কিন্তু তবু ভাল ঘুম হ'ল না। শেষরাত্রির দিকে জঙ-বাহাদুর আমার গা ঠেলে চুপি চুপি বললে,—'চলুন—পালাই।"

আমি বললুম,—'আপত্তি নেই। কিন্তু দরজায় শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে যে।'

'জঙ-বাহাদুর দরজা ফাঁক ক'রে একবার উঁকি মেরে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

'ভোর হ'তে না হ'তে কাপ্তেন সাহেব নিজে এসে আমাদের ডেকে তুললেন। তার পর সুমিষ্ট স্বরে সুপ্রভাত জ্ঞাপন ক'রে আমাদের নদীর ধারে বাঁধাঘাটে নিয়ে গেলেন।

'দেখলুম, কিনারায় একটি ছোট বেতের ডোঙা বাঁধা রয়েছে, আর ঘাটের শানের উপর বারো জন রাইফেলধারী সেপাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'কাপ্তেন আমাদের করমর্দ্দন ক'রে বললেন,—'আপনাদের সঙ্গ-সুখ পেয়ে আমার একটা দিন বড় আনন্দে কেটেছে। কিন্তু এবার আপনাদের যেতে হবে।'

'পরপারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন,—'শ্যামরাজ্যের ঐ অংশটা বড় অনুর্ব্বর, এক-শ মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই। আপনাদের সঙ্গে খাবার দিয়েছি। রাইফেলও দিলাম, আর পাঁচটা কার্তুজ। এরই সাহায্যে আশা করি আপনারা নির্ব্বিঘ্নে লোকালয়ে পৌঁছতে পারবেন। —বঁ ভোয়াজ।'

'আমি আপত্তি করতে গেলুম, তিনি হেসে বললেন,—'ডোঙায় উঠুন। নদীর এপারে নামবার চেষ্টা করবেন না, তা হ'লে—সৈন্যদের দিকে হাত নেড়ে দেখালেন।

'ডোঙায় গিয়ে উঠলুম, বারো জন সৈনিক বন্দুক তুলে আমাদের দিকে লক্ষ্য ক'রে রইল।

'তীর থেকে বিশ গজ দূরে ডোঙা যাবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলুম, —'আমাদের অপরাধ কি তাও কি জানতে পারব না?'

'তিনি ঘাট থেকে ভাঙা-ভাঙা ইংরাজীতে বললেন,—'আনামে ব্রিটিশ গুপ্তচরের স্থান নেই।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রমথেশ রুদ্র থামিলেন। তাঁহার মুখে ধীরে ধীরে

একটি অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—'একেই বলে দৈব বিড়ম্বনা। কাপ্তেন দু'বোয়া আমাদের হাতে মিলিটারি বন্দুক দেখে আমাদের ইংরেজের গোয়েন্দা মনে করেছিলেন।'

আমি বলিলাম,—'কিন্তু ইংলণ্ড আর ফ্রান্সে তো এখন বন্ধুত্ব চলছে!'

'হুঁ—একেবারে গলাগলি ভাব। কিন্তু ওরা আজ পর্য্যন্ত কখনও পরস্পরকে বিশ্বাস করে নি এবং যত দিন চন্দ্রসূর্য্য থাকবে তত দিন করবে না। ওরা শুধু দুটো আলাদা জাত নয়, মানব-সভ্যতার দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের প্রতীক। কিন্তু সে যাক—' বলিয়া আবার গল্প আরম্ভ করিলেন।

'যতক্ষণ নদী পার হলুন, সিপাহীরা বন্দুক উঁচিয়ে রইল। বুঝলাম, দুটি মাত্র পথ আছে—হয় পরপার, নয় পরলোক। তৃতীয় পন্থা নেই।

'পরপারেই গিয়ে নামলুম। তার পর বন্দুক আর খাবারের হ্যাভারস্যাক্ কাঁধে ফেলে শ্যামদেশের লোকালয়ের সন্ধানে রওনা হয়ে পড়া গেল।

'প্রায় নদীর কিনারা থেকেই পাহাড় আরম্ভ হয়েছে। আনাম-রাজ্য এবং মেকং নদী পিছনে রেখে চড়াই উঠতে আরম্ভ করলুম। পাহাড়ের পথ বন্ধুর দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু আমরা পথশ্রমে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলুন; এই পার্ব্বত্য ভূমি যত শীঘ্র সম্ভব পার হবার জন্যে সজোরে পা চালিয়ে দিলুম।

'দুপুরবেলা নাগাদ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছলুম যেখান থেকে চারি দিকে অগণ্য নীরস পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না—গাছপালা পর্য্যন্ত নেই, কেবল পাথর আর পাথর।

'বিলক্ষণ ক্ষিদে পেয়েছিল। খাবারের ঝুলি নামিয়ে দু'জনে খেতে বসলুম। ঝুলি খুলে দেখি, তাজা খাবার কিছু নেই, কেবল কতকগুলা

টিনের কৌটা। যাগোক, যে-অবস্থায় পড়েছি তাতে টিনে-বন্ধ চালানি খাবারই বা ক'জন পায় ?

'কিন্তু টিনের লেবেল দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল—Corned beef—গো-মাংস! পরস্পর মুখের দিকে তাকালুম। জঙ-বাহাদুর খাঁটি হিন্দু, কিছুক্ষণ মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে ব'সে রইল, তার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

'কোনও কথা হ'ল না, দু'জনে আবার চলতে আরম্ভ করলুম। অখাদ্য টিনগুলা পিছনে প'ড়ে রইল।

'তার পর আমাদের যে দুর্গতির অভিযান আরম্ভ হ'ল তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে আপনাকে দুঃখ দেব না। আকাশে একটা পাখী নেই, মাটিতে অন্য জন্তু তো দূরের কথা, একটা গিরগিটি পর্য্যন্ত দেখতে পেলুম না। তৃষ্ণায় টাকরা শুকিয়ে গেল কিন্তু জল নেই।

'প্রথম দিনটা এক দানা খাদ্য বা এক ফোঁটা জল পেটে গেল না। রাত্রি কাটালুম খোলা আকাশের নীচে কম্বল মুড়ি দিয়ে। দ্বিতীয় দিন বেলা তিন প্রহরে একটা জন্তু দেখতে পেলুম, কিন্তু এত দূরে যে, সেটা কি জন্তু তা চেনা গেল না। কিন্তু আমাদের অবস্থা তখন এমন যে, মা ভগবতী ছাড়া কিছুতেই আপত্তি নেই। প্রায় তিন-শ গজ দূর থেকে তার উপর গুলি চালালুম—কিন্তু লাগল না। মোট পাঁচটি কার্ত্তুজ ছিল, একটি গেল।

'সেদিন সন্ধ্যার সময় জল পেলুম। একটা পাথরের ফাটল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল চুইয়ে পড়ছে, আধ ঘণ্টায় এক গণ্ডুষ জল ধরা যায়। জঙ-বাহাদুরের মুখ ঝামার মত কালো হয়ে গিয়েছিল; আমার মুখও যে অনুরূপ বর্ণ ধারণ করেছিল তাতে সন্দেহ ছিল না। শরীরের রক্ত

তরল বস্তুর অভাবে গাঢ় হয়ে আসছিল; সেদিন জল না পেলে বোধ হয় বাঁচতুম না।

'কিন্তু তবু শুধু জল খেয়ে বেঁচে থাকা যায় না। শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, মাথাও বোধ হয় আর ধাতস্থ ছিল না। তৃতীয় দিনের ঘটনাগুলা একটানা দুঃস্বপ্নের মত মনে আছে। একটা লালচে রঙের খরগোশ দেখতে পেয়ে তারই পিছনে তাড়া করেছিলুম—দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। খরগোশটা আমাদের সঙ্গে যেন খেলা করছিল; একেবারে পালিয়েও যাচ্ছিল না, আবার বন্দুকের পাল্লার মধ্যেও ধরা দিচ্ছিল না। তার পিছনে দুটো কার্ত্তুজ খরচ করলুম; কিন্তু চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে, হাতও কাঁপছে, খরগোশটা মারতে পারলুম না।

'সন্ধ্যেবেলা একটা লম্বা বাঁধের মত পাহাড়ের পিঠের উপর উঠে খরগোশ মিলিয়ে গেল। দেহে তখন আর শক্তি নেই, বন্দুকটা অসহ্য ভারি বোধ হচ্ছে; তবু আমরাও সেখানে উঠলুম। বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তখন চলছি না, একটা অন্ধ আবেগের ঝোঁকেই খরগোশের পশ্চাদ্ধাবন করেছি। পাহাড়ের উপর উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেল, একটা সবুজ রঙের আলো চোখের সামনে ঝিলিক্ মেরে উঠ্ল; তার পর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

'যখন মূর্চ্ছা ভাঙল তখন রোদ উঠেছে। জঙ-বাহাদুর তখনও আমার পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আর—আর সামনেই ঠিক পাহাড়ের কোলে যত দূর দৃষ্টি যায় একটি সবুজ ঘাসে-ভরা উপত্যকা। তার বুক চিরে জরির ফিতের মত একটি সরু পার্ব্বত্য নদী বয়ে গেছে।

'কিছুক্ষণ পরে জঙ-বাহাদুরের জ্ঞান হ'ল। তখন দু'জনে দু'জনকে অবলম্বন ক'রে টলতে টলতে পাহাড় থেকে নেমে সেই নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

'তৃষ্ণা নিবারণ হ'ল। আকণ্ঠ জল খেয়ে ঘাসের ওপর অনেকক্ষণ পড়ে রইলুম। আপনি এখনি চায়ের সঙ্গে অমৃতের তুলনা করছিলেন ; আমরা সেদিন যে-জল খেয়েছিলুম, অমৃতও বোধ করি তার কাছে বিস্বাদ।

'কিন্তু সে যাক—তৃষ্ণানিবারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার ভাবনা এসে জুটেছিল। তাকে মেটাই কি দিয়ে ?

'আমাদের উপত্যকার চারিদিকে তাকালুম, কিন্তু কোথাও একটি প্রাণী নেই। এখানে-ওখানে কয়েকটা গাছ যেন দলবদ্ধ হয়ে জন্মেছে, হয়ত কোন গাছে ফল ফলেছে এই আশায় উঠে বললুম—'জঙ-বাহাদুর, চল দেখি, যদি গাছে কিছু পাই।'

'গাছে কিন্তু ফল-ফলবার সময় নয়। একটা কুলের মত কাঁটাওয়ালা গাছে ছয়টি ছোট ছোট কাঁচা ফল পেলুম। তৎক্ষণাৎ দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে উদরসাৎ করলুম। দারুণ টক্—কিন্তু তবু খাদ্য তো!

'আরও ফলের সন্ধানে অন্য একটা ঝোপের দিকে চলেছি, জঙ-বাহাদুর পাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল,—'ঐ —ঐ দেখুন!'

'ঘাড় ফিরিয়ে দেখি—আশ্চর্য্য দৃশ্য! সাদা ধবধবে একপাল হরিণ নির্ভয়ে মন্থর-পদে নদীর দিকে চলেছে। সকলের আগে একটা শৃঙ্গধর মদ্দা হরিণ, তার পিছনে গুটি আট-দশ হরিণী। আমাদের কাছ থেকে প্রায় এক-শ গজ দূরে তারা যাচ্ছে।

'কিন্তু এ দৃশ্য দেখলুম মুহূর্ত্ত কালের জন্যে। জঙ-বাহাদুরের চীৎকার বোধ হয় তাদের কাণে গিয়েছিল—তারা একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে চাইলে। তার পর এক অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল। হরিণগুলা দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

'হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম ; তার পর চোখ রগড়ে আবার দেখলুম। কিছু নেই—রৌদ্রোজ্জ্বল উপত্যকা একেবারে শূন্য।

'ভয় হ'ল। এ কি ভৌতিক উপত্যকা? না আমরাই ক্ষুধার মত্ততায় কাল্পনিক জীবজন্তু দেখতে আরম্ভ করেছি? মরুভূমিতে শুনেছি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় উন্মাদ পান্থ মৃত্যুর আগে এমনি মায়ামূর্ত্তি দেখে থাকে। তবে কি আমাদেরও মৃত্যু আসন্ন!

'জঙ-বাহাদুরের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার চোখ দুটো পাগলের মত বিস্ফারিত। সে ত্রাস-কম্পিত স্বরে ব'লে উঠল—'এ আমরা কোথায় এসেছি!'—তার ঘাড়ের রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠল।

'দু'জনে একসঙ্গে ভয়ে দিশাহারা হ'লে চলবে না। আমি জঙ-বাহাদুরকে সাহস দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু বোঝাব কি? নিজেরই তখন ধাত ছেড়ে আসছে!

'একটা ঘন ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসলুম। খাবার খোঁজবার উদ্যমও আর ছিল না ; অবসন্ন ভাবে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

'আধ ঘণ্টা এই ভাবে কেটে যাবার পর হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলুম ; ঠিক মনে হ'ল একপাল হরিণ ক্ষুরের শব্দ ক'রে আমাদের পাশ দিয়ে দ্রুত ছুটে চলে গেল। পরক্ষণেই পিছন দিকে ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ে বাঘের চীৎকার যেন বাতাসকে চিরে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলে। ফিরে দেখি, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে প্রকাণ্ড দুটো ধূসর রঙের নেকড়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তারা আর একবার চীৎকার ক'রে উঠল—শিকার ফস্কে যাওয়ার ব্যর্থ গর্জ্জন। তার পর অনিচ্ছাভরে বিপরীত মুখে চ'লে গেল।

'অনেক দূর পর্য্যন্ত তাদের দেখতে পেলুম। এবার নূতন রকমের ধোঁকা লাগল। তাই তো! নেকড়ে দুটো তো মিলিয়ে গেল না!

তবে তো আমাদের চোখের ভ্রান্তি নয়! অথচ হরিণগুলা অমন কর্পূরের মত উবে গেল কেন? আর, এখনই যে ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পেলুম সেটাই বা কি?

'ক্রমে বেলা দুপুর হ'ল। শরীর নেতিয়ে পড়ছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। উপত্যকায় পৌছনোর প্রথম উত্তেজনা কেটে গিয়ে তিন দিনের অনশন আর ক্লান্তি দেহকে আক্রমণ করেছে। হয়ত এই ভাবে নিস্তেজ হ'তে হ'তে ক্রমে তৈলহীন প্রদীপের মত নিবে যাব।

'নিবে যেতুমও, যদি না এই সময় একটি পরম বিস্ময়কর ইন্দ্রজাল আমাদের চৈতন্যকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলত। অসাড় ভাবে নদীর দিকেই তাকিয়ে ছিলুম, সূর্য্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছিল। এই সময় দেখলুম নদীর কিনারায় যেন অস্পষ্ট ভাবে কি নড়ছে। গ্রীষ্মের দুপুরে তপ্ত বালির চড়ার ওপর যেমন বাষ্পের ছায়াকুণ্ডলী উঠতে থাকে, অনেকটা সেই রকম। ক্রমে সেগুলো যেন আরও স্থূল আকার ধারণ করলে। তার পর ধীরে ধীরে একদল সাদা হরিণ আমাদের চোখের সামনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে দাঁড়াল।

'মুগ্ধ অবিশ্বাস ভরে চেয়ে রইলুম। এও কি সম্ভব? এরা কি সত্যিই শরীর-ধারী? তাদের দেখে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই; সাদা রোমশ গায়ে সূর্য্যের আলো পিছলে পড়ছে। নিশ্চিন্ত অসঙ্কোচে তারা নদীতে মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রে খেলা করছে,—কেউ বা নদীর ধারের কচি ঘাস ছিঁড়ে তৃপ্তি ভরে চিবচ্ছে।

'জঙ-বাহাদুর কখন রাইফেল তুলে নিয়েছিল তা জানতে পারিনি, এত তন্ময় হয়ে দেখছিলুম। হঠাৎ কাণের পাশে গুলির আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠলুম; দেখি জঙ-বাহাদুরের হাতে রাইফেলের নল কম্পাসের

কাঁটার মত দুলছে। সে রাইফেল ফেলে দিয়ে বললে,—'পারলাম না, ওরা মায়াবী।'

'হরিণের দল তখন আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'এতক্ষণে এই অদ্ভুত হরিণের রহস্য যেন কতক বুঝতে পারলুম। ওরা অশরীরী নয়, সাধারণ জীবের মত ওদেরও দেহ আছে, কিন্তু কোনও কারণে ভয় পেলেই ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়। খানিকক্ষণ আগে ওদের নেকড়ে তাড়া করেছিল, তখন ওদেরই অদৃশ্য পদধ্বনি আমরা শুনেছিলুম। প্রকৃতির বিধান বিচিত্র! এই পাহাড়ে-ঘেরা ছোট উপত্যকাটিতে ওরা অনাদি কাল থেকে আছে; সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র জন্তুরাও আছে। তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার আর কোনও অস্ত্র ওদের নেই, তাই শত্রু দেখলেই ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়।'

বক্তা আবার থামিলেন। সেই গূঢ়ার্থ হাসি আবার তাঁহার মুখে খেলিয়া গেল।

আমি মোহাচ্ছন্নের মত শুনিতেছিলাম। অলৌকিক রূপকথাকে বাস্তব আবহাওয়ার মাঝখানে স্থাপন করিলে যেমন শুনিতে হয়, গল্পটা সেইরূপ মনে হইতেছিল; বলিলাম,—'কিন্তু এ কি সম্ভব? অর্থাৎ বিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে অপ্রাকৃত নয় কি?'

তিনি বলিলেন,—'দেখুন, বিজ্ঞান এখনও সৃষ্টি-সমুদ্রের কিনারায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তীরের উপলখণ্ড কুড়িয়ে ঝুলি ভরছে—সমুদ্রে ডুব দিতে পারেনি। তা ছাড়া, অপ্রাকৃতই বা কি ক'রে বলি? ক্যামিলিয়ন নামে একটা জন্তু আছে, সে ইচ্ছামত নিজের দেহের রং বদলাতে পারে। প্রকৃতি আত্মরক্ষার জন্য তাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন। বেশী দূর যাবার দরকার নেই, আজ যে আপনি হারিয়াল মেরেছেন তাদের কথাই ধরুন না। হারিয়াল একবার গাছে বসলে আর তাদের দেখতে পান কি?'

বলিলাম,—'তা পাই না বটে। গাছের পাতার সঙ্গে তাদের গায়ের রং মিশে যায়।'

তিনি বলিলেন,—'তবেই দেখুন, সেও তো এক রকম অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। এই হরিণের অদৃশ্য হওয়া বড়জোর তার চেয়ে এক ধাপ উঁচুতে।'

'তার পর বলুন।'

ব্যাপারটা মোটামুটি রকম বুঝে নিয়ে জঙ-বাহাদুরকে বললুম,—'ভয় নেই জঙ-বাহাদুর, ওরা মায়াবী নয়! বরং আমাদের বেঁচে থাকবার একমাত্র উপায়।

'একটি মাত্র কার্ত্তুজ তখন অবশিষ্ট আছে—এই নিরুদ্দেশ যাত্রাপথের শেষ পাথেয়। এটি যদি ফস্কায় তাহ'লে অনশনে মৃত্যু কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

'টোটা রাইফেলে পূরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ব'সে রইলুম—হয়ত তারা আবার এখানে আসবে জল খেতে। কিন্তু যদি না আসে? দু'বার এইখানেই ভয় পেয়েছে—না আসতেও পারে।

'দিন ক্রমে ফুরিয়ে এল; সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা প'ড়ে গেল। জঙ-বাহাদুর কেমন যেন নিঝুম তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ব'সে আছে; আমি প্রাণপণ শক্তিতে নিরাশা আর অবসাদকে দূরে ঠেলে রেখে প্রতীক্ষা করছি।

'নদীর জলের ঝক্‌ঝকে রূপালী রং মলিন হয়ে এল, কিন্তু হরিণের দেখা নেই। নিরাশাকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না। তারা সত্যিই পালিয়েছে, আর আসবে না।

'কিন্তু প্রকৃতির বিধানে একটা সামঞ্জস্য আছে,—এমার্সন যাকে law of compensation বলেছেন। এক দিক দিয়ে প্রকৃতি যদি কিছু কম দিয়ে ফেলেন, অন্য দিক দিয়ে অমনি তা পূরণ ক'রে দেন। এই

হরিণগুলোকে তিনি বুদ্ধি কম দিয়েছেন বলেই বোধ হয় এমন অপরূপ আত্মরক্ষার উপায় ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দান করেছেন। অন্ধকার হ'তে আর দেরি নেই এমন সময় তারা আবার ঠিক সেই জায়গায় এসে আবির্ভূত হ'ল।

'তাদের দেখে আমার বুক ভীষণ ভাবে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তারা আগের মতই দলবদ্ধ হয়ে এসেছে—তেমনই স্বচ্ছন্দ মনে ঘাস খাচ্ছে—খেলা করছে। আমি রাইফেলটা তুলে নিলাম। পাল্লা বড়জোর পঁচাত্তর গজ, রাইফেলের পক্ষে কিছুই নয; তবু হাত কাঁপছে, কিছুতেই ভুলতে পারছি না এই শেষ কার্তুজ—

'নিজের রাইফেলের আওয়াজে নিজেই চমকে উঠলুম। একটা হরিণ খাড়া উঁচু দিকে লাফিয়ে উঠল—তার পর আবার সমস্ত দল ছায়াবাজির মত মিলিয়ে গেল।

'শেষ কার্তুজও ব্যর্থ হ'ল! পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসাড় মন নিয়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইলুম। তার পর আস্তে আস্তে চেতনা ফিরে এল। মনে হ'ল যেখানে হরিণগুলো দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে একগুচ্ছ লম্বা ঘাস আপনা-আপনি নড়ছে।

'কি হ'ল! তবে কি—? ধুঁকতে ধুঁকতে দু'জনে সেখানে গেলুম।

'বাতাস বইছে না, কিন্তু তবু ঘাসগুলো নড়ছে—যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাদের নড়াচ্ছে। ক্রমে ঘাসের আন্দোলন কমে এল। তার পর ছায়ার মত আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল—চারিটি হরিণের ক্ষুর।

'মরেছে! মরেছে!'—জঙ-বাহাদুর ভাঙা গলায় চীৎকার ক'রে উঠল। আমি তখন পাগলের মত ঘাসের উপর নৃত্য সুরু ক'রে দিয়েছি। একটা নিরীহ ভীরু প্রাণীকে হত্যা ক'রে এমন উৎকট আনন্দ কখনও অনুভব করিনি।

'পনর মিনিটের মধ্যে মৃত হরিণের দেহটি পরিপূর্ণ দেখা গেল। মৃত্যু এসে তার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের চোখের সামনে প্রকট ক'রে দিলে।...

'তারই চামড়ার উপর আপনি আজ ব'সে আছেন।'

তাঁহার গল্প হঠাৎ শেষ হইয়া গেল।

আমি বলিলাম,—'তার পর?'

তিনি বলিলেন,—'তার পর আর কি—শূন্য মাংস খেয়ে প্রাণ বাঁচালুম। সাত দিন পরে সেই উপত্যকার গণ্ডী পার হয়ে লোকালয়ে পৌঁছলাম। তার পর দু'মাস একাদিক্রমে হেঁটে এক দিন ব্যাঙ্কক শহরে পদার্পণ করা গেল। সেখান থেকে জঙ-বাহাদুর চীনের জাহাজে চড়ল; আর আমি—; মাংসটা বোধ হয় তৈরি হ'য়ে গেছে।'

৪

আহার শেষ করিয়া যখন এই ভাঙা বাড়ী হইতে বাহির হইলাম তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

বন্ধু আমার সঙ্গে চলিলেন। টর্চ্চ জ্বালিলেন না, অন্ধকারে আমার বাইকের একটা হাতল ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন।

প্রায় দশ মিনিট নীরবে চলিয়াছি। কোন্ দিকে চলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই; মনে হইতেছে যে-পথে আসিয়াছিলাম সে পথে ফিরিতেছি না।

হঠাৎ বন্ধু বলিলেন,—'আজ সন্ধ্যাটা আমার বড় ভাল কাটল।'

আমি বলিলাম,—'আপনার—না আমার?'

'আমার। মাসখানেকের মধ্যে মন খুলে কথা কইবার সুযোগ পাইনি।'

আরও পনর মিনিট নিঃশব্দে চলিলাম। তার ’পর তিনি আমার হাতে টর্চ্চ দিয়া বলিলেন,—‘পাকা রাস্তায় পৌঁছে গেছেন, এখান থেকে সহজেই বাড়ী ফিরতে পারবেন। এবার বিদায়। আর বোধ হয় আমাদের দেখা হবে না।’

আমি বলিলাম,—‘সে কি! আমি আবার আসব। অন্ততঃ আপনার টর্চ্চটা ফেরত দিতে হবে তো।’

‘আসার দরকার নেই। এলেও আমার আস্তানা খুঁজে পাবেন না। টর্চ্চ আপনার কাছেই থাক—একটা সন্ধ্যার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ। আমি দু’চার দিনের মধ্যেই চ’লে যাব।’

‘কোথায় যাবেন?’

তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—‘তা জানি না। হয়ত আবার শ্যামদেশে যাব। এবার একটা জীবন্ত হরিণ ধ’রে আনবার চেষ্টা করব—কি বলেন?’

‘বেশ তো। কিন্তু—আর আমাদের দেখা হবে না?’

‘সম্ভব নয়। আচ্ছা—বিদায়।’

‘বিদায়। দুর্দ্দিনের বন্ধু—নমস্কার।’

কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া টর্চ্চ জ্বালিলাম—দেখিলাম, তিনি নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছেন।

* * * *

কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল না, আর একবার দেখা হইল। দিন-সাতেক পরে একদিন রাত্রি সাতটার ট্রেনে আমার এক আত্মীয়কে তুলিয়া দিতে ষ্টেশনে গিয়াছি—অকস্মাৎ তাঁহার সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া গেল।

‘একি! আপনি!’

তাঁহার মাথায় একটা কান-ঢাকা টুপী ; গায়ে সেই সোয়েটার ও লুঙ্গি। একটু হাসিয়া বলিলেন,—'যাচ্ছি।'

এই সময় ঘণ্টা বাজিল। ষ্টেশনে ভীড় ছিল ; এক জন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী প্রকাণ্ড পোঁটলাসুদ্ধ পিছন হইতে আমাকে ধাক্কা মারিল। তাল সামলাইয়া ফিরিয়া দেখি—বন্ধু নাই।

বিস্মিতভাবে এদিক-ওদিক তাকাইতেছি—দেখি আমাদের শশাঙ্ক-বাবু আসিতেছেন। পুলিসের ডি-এস্-পি হইলেও লোকটি মিশুক। পরিচয় ছিল, এড়াইতে পারিলাম না ; জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি খবর ? আপনি কোথায় চলেছেন ?'

'যাব না কোথাও। ষ্টেশনে বেড়াতে এসেছি।'—বলিয়া মৃদু হাস্যে তিনি অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

গাড়ী ছাড়িবার সময় হইয়া গিয়াছিল। তবু বন্ধুকে চারিদিকে খুঁজিলাম ; কিন্তু এই দুই মিনিটের মধ্যে তিনি তাঁহার মায়ামৃগের মতই এমন অদৃশ্য হইয়াছিলেন যে, আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না।

তার পর হইতে এই এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে দেখি নাই ; আর কখনও দেখিব কিনা জানি না।

* * * *

গল্প-সাহিত্যের আইন-কানুন অনুসারে এ কাহিনী বোধ হয় বহুপূর্ব্বেই শেষ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। বস্তুতঃ মায়া-হরিণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া দেখিতেছি, 'ধান ভানিতে শিবের গীতই' বেশী গাহিয়াছি ; গল্পের চেয়ে গল্পের বক্তার কথাই বেশী বলিয়াছি। আমি প্রথিতযশা কথা-শিল্পী নই, এইটুকুই যা রক্ষা, নহিলে লজ্জা রাখিবার আর স্থান থাকিত না।

যা হোক, আইন-ভঙ্গ যখন হইয়াই গিয়াছে তখন আর একটু বলিব।

এই কাহিনী লেখা সমাপ্ত করিবার পর একটি চিঠি পাইয়াছি, সেই চিঠিখানি উপসংহার-স্বরূপ এই সঙ্গে যোগ করিয়া দিব।

প্রীতিনিলয়েষু,

আমাকে বোধ হয় ভোলেন নাই। শ্যামদেশে গিয়াছিলাম, কিন্তু সে-হরিণ ধরিয়া আনিতে পারি নাই। বন্দী-দশায় উহারা বাঁচে না—না খাইয়া মরিয়া যায়।

ইতি—

শ্রীপ্রমথেশ রুদ্র

চিঠিতে তারিখ বা ঠিকানা নাই। পোষ্ট-অফিসের মোহরও এমন অস্পষ্ট যে কিছু পড়া যায় না।

২৮ পৌষ ১৩৪৩

সন্ধি-বিগ্রহ

ঘোড়্‌সোয়ারের মত মোটা ডালের দু'পাশে পা ঝুলাইযা বসিয়া নিতাইবাবু গভীর ভাবে চিন্তা কবিতেছিলেন। ঝোঁকের মাথায় যা-হোক একটা কিছু কবিয়া ফেলিবাব বয়স আব তাঁহাব নাই ; প্রবীণ সেনাপতির মত সব দিক দেখিয়া-শুনিযা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিযা কাজ করিতে হইবে। বিশেষতঃ আজ ব্যাপারটা সত্যই অতিশয ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে।

বহু নিম্নে বৃদ্ধ বটগাছের নিশ্ছিদ্র ছায়া মদের চারি পাশের স্থানটিকে অন্ধকার করিয়া রাখিযাছে, গাছেব ঝুরিগুলা সারি সাবি দড়িব মত ঝুলিতেছে। বেলা মধ্যাহ্ন। নিতাইবাবু উদবেব মধ্যে বৃশ্চিক দংশনের মত একটা জ্বালা অনুভব করিলেন, বুঝিলেন তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। তিনি কামিজের পকেট দু'টা আর একবার ভাল করিয়া অনুসন্ধান কবিলেন, কিন্তু কিছুই পাইলেন না। তুঁত ফল ও পেয়ারা যে ক'টা পকেটে ছিল তাহা বহু পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। চিন্তিত ভাবে নিতাইবাবু উপরের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলেন। এতক্ষণ একটা একটানা গুঞ্জন ধ্বনি তাঁহাব কর্ণে আসিতেছিল, কিন্তু মানসিক দুশ্চিন্তা হেতু তাহাব কারণ তদারক করা হয় নাই। এখন দেখিলেন, তাঁহার মাথার প্রায দশ-বার হাত উর্দ্ধে একটা মোটা ডাল হইতে প্রকাণ্ড অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মৌমাছির চাক ঝুলিয়া আছে। নিতাই-বাবু তাঁহার ক্ষুধার জ্বালা ও বর্ত্তমান সমস্যা ভুলিয়া কৌতূহলী ভাবে কিছুক্ষণ মৌমাছিপূর্ণ চাকটার দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তার পর অতি

সন্তর্পণে দুটা ডাল নামিয়া বসিলেন। মৌচাকের সান্নিধ্য যে নিরাপদ নয় নিতাইবাবু তাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা ভালরূপ জ্ঞাত ছিলেন।

অতঃপর শাখারূঢ় নিতাইবাবু আবার গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বটগাছের পাশ দিয়া পাকা রাস্তা গিয়াছে, রাস্তার অপর পারে ঠিক বটগাছের সম্মুখেই প্রকাণ্ড হাতা-যুক্ত বাড়ীর লোহার ফটক, ফটকের পাশে দরোযানের দেউড়ি। নিতাইবাবু যেখানে গাছের উচ্চশাখায় বসিয়া আছেন সেখান হইতে বাড়ীখানা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বের পাঁচিলঘেরা ভূভাগ পরিষ্কার দেখা যায়। এমন কি বাড়ী হইতে উঁচু গলায় কথা কহিলে শোনা পর্য্যন্ত যায়। বাড়ীর মধ্যে কাহারা যাতায়াত করিতেছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবারও কোন অসুবিধা নাই।

কিন্তু প্রধান অসুবিধা—নিতাইবাবুর পক্ষে—এই বাড়ীতে প্রবেশ করা। প্রথমতঃ সদরে দরোয়ান আছে, সুতরাং সেদিক দিয়া প্রবেশ করা চলিবে না। পিছনের দেওযাল ডিঙাইয়া বাগানে ঢোকা যাইতে পারে, কিন্তু তাব পর? বাড়ীর ভিতর মাথা গলাইবার উপায় কি? সেখানে বিন্দি আছে, দেখিলেই ধরাইয়া দিবে, দয়ামায়া করিবে না। তা ছাড়া নিতাইবাবুব খুড়োমহাশয় স্বয়ং একটা চাবুক হাতে লইয়া বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং মাঝে মাঝে গর্জ্জন ছাড়িতেছেন। তাঁহার চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হইবে না। অবশ্য, কোন রকমে একবার ঠাকুরমার কাছে গিয়া পৌছিতে পারিলে—

কিন্তু একটা কথা এথনো বলা হয় নাই—নিতাইবাবুর বয়ঃক্রম পূর্ণ নয় বৎসর।

অদ্য প্রাতঃকালে তিনি একটি গুরুতর দুষ্কার্য্য করিয়া বাড়ী হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কাল সন্ধ্যাবেলা জ্যেষ্ঠা ভগিনী একাদশ-বর্ষীয়া বিন্দুর সহিত তাঁহার ঝগড়া হইয়াছিল। ফলে, চিরকাল যাহা

হইয়া আসিয়াছে,' বিন্দি কাকা ও বাবাকে নালিশ মানিয়া মোকদ্দমা জিতিয়া গেল। :ক্রুদ্ধ নিতাইবাবু তখন চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু আজ সকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই সে-পরাজয়ের ভাষণ প্রতিশোধ লইলেন। নিতাইবাবু বিন্দির সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতেন। প্রভাতে বিন্দি ঘুম ভাঙিয়া দেখিল তাহার মাথায় খোঁপা নাই। বিহ্বলভাবে এদিক-ওদিক চাহিতে দৃষ্টি পড়িল খোঁপাটি অবিকৃত অবস্থায় সম্মুখের দেয়ালে ঘুঁটের মত আটকাইয়া রহিয়াছে।

নিতাইবাবু নিজের কার্য্যের ফলাফল জানিবার জন্য আনাচে-কানাচে বেড়াইতেছিলেন, বিন্দির চিল-চীৎকার কর্ণে প্রবেশ করিবা-মাত্র তিনি বুঝিলেন কাজটা ভাল হয় নাই, একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে। তিনি নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিলেন।

তারপর পাড়ার এদিক-ওদিক বেড়াইয়া, জনৈক প্রতিবেশীর বাগান হইতে কিছু তুঁত ও পেয়ারা সংগ্রহ করিয়া বেলা দশটা আন্দাজ যখন দেখিলেন যে বাড়ার চাকর-বাকর তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে তখন তিনি গোপনে এই বটগাছের শাখায় আশ্রয় লইয়াছেন এবং নিজে অলক্ষ্যে থাকিয়া প্রতিপক্ষের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

কিন্তু বিপদের কথা এই যে, রসদ একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। খালি পেটে যুদ্ধ কতক্ষণ সম্ভব? নিতাইবাবু কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইলেন এই সময় কি কি খাদ্য বাড়ীতে তৈয়ার হইয়াছে; তাঁহার মুখ লালসার প্রাবল্যে শীর্ণভাব ধারণ করিল। কিন্তু তিনি কোমরের কসি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া পা দুলাইতে লাগিলেন। কারণ, কল্পনার চক্ষে ভোজ্য বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জিনিষ তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন—সেটি কাকার হাতের লিক্‌লিকে সরু চাবুকটি।

অবশ্য প্রহার বস্তুটি নিতাইবাবুর জীবনে নূতন নয়। সামান্য কিলটা চড়টার কথা ছাড়িয়া দিই, সে তো নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু যাহাকে 'সাতচোরের মার' বলে সেইরূপ দুর্জ্জয় প্রহারও তাঁহার ভাগ্যে বিরল নয়—প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বাড়ীর লোকের কেমন একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, পাড়ার চতুঃসীমায় কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটিলেই সকলের সন্দেহ নিতাইবাবুর উপর আসিয়া পড়ে এবং সন্দেহটা যথার্থ কি অলীক তাহা নিরাকরণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পৃষ্ঠে ও মস্তকে নানাপ্রকার অপ্রীতিকর বস্তু বর্ষিত হইতে থাকে। এই তো সেদিন, নিতান্ত অকারণেই নিতাইবাবুকে অশেষ লাঞ্ছনা নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে।

এ ব্যাপারে তাঁহার বিন্দুমাত্র দোষ ছিল না; এমন কি, কেমন করিয়া কি হইল, সে বিষয়ে একটা ধোঁকার ভাব তাঁহার মনে রহিয়া গিয়াছিল। বিন্দু ছাতের উপর খেলাঘর পাতিয়াছিল, সেদিন তাহার খেলাঘরে চড়ুইভাতি ছিল। বিন্দু ব্যস্তসমস্তভাবে রান্নার যোগাড় করিতে করিতে গলার হারছড়া ছাতে ফেলিয়াই নীচে নামিয়া গিয়াছিল। এই সুযোগে নিতাইবাবু নেহাৎ পরিহাসচ্ছলেই হারটা গুড়ের বাটিতে ডুবাইয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার মনে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না; কেবল ইহাই উদ্দেশ্য ছিল যে, গুড়ের লোভে হারে পিঁপড়া লাগিবে এবং তারপর বিন্দু যখন না দেখিয়া আবার সেটা গলায় দিবে তখন একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় ঘটিয়া যাইবে।

অভিনয় কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের হইল। কিয়ৎকাল পরে বিন্দু চীৎকার করিতে করিতে নামিয়া আসিয়া খবর দিল যে, নিতাই তাহার হার লইয়া পলাইয়াছে! নিতাইবাবুকে ধরিয়া আনা হইল,

কিন্তু তিনি সবেগে মাথা নাড়িয়া অভিযোগ অস্বীকার করিলেন। গুড়-মাখানোর কথাটাও অবস্থাগতিক দেখিয়া চাপিয়া যাইতে হইল। কিন্তু তাঁহার কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। কাকা কর্ণে প্যাঁচ দিয়া বলিলেন,—'কোথায় রেখেছিস নিয়ে আয়, তাহ'লে কিছু বল্‌ব না।'

কিন্তু যে-জিনিষের সন্ধান জানা নাই তাহা কি করিয়া আনা যাইতে পারে। নিতাইবাবু হার আনিতে পারিলেন না। কান্নটি চড়ে উঠিল। তথাপি হার বাহির হইল না। তখন কাকা বেত আনিয়া নিতাইবাবুর পৃষ্ঠ ও নিকটবর্ত্তী আর একটা স্থান রক্তবর্ণ করিয়া দিলেন। নিতাইবাবুর মনে হইতে লাগিল যে ইন্দ্রজাল-প্রভাবে যদি একটা সোনার হার তৈয়ার করিয়া আনিয়া দিতে পারিতেন তাহা হইলে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিতেন। কিন্তু ভোজবিদ্যার পারদর্শিতা না থাকায় তাঁহাকে কেবল পড়িয়া-পড়িয়া মার খাইতে হইল।

কাকা অবশেষে ক্লান্ত হইয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন,—'বড় হয়ে এটা দাগী চোর হবে—একেবারে সি ক্লাস! নিয়ে যা আমার সুমুখ থেকে।'

ইহা দশ-বার দিন আগের ঘটনা। তারপর বিন্দু তাঁহাকে অনেক খোসামোদ করিয়াছে, কিন্তু অত মার খাইবার পর যে সকল নষ্টের গোড়া তাহার সহিত এক কথায় সদ্ভাব স্থাপন করা চলে না; নিতাইবাবু গর্ব্বিত ভাবে বিন্দুর সন্ধিব প্রযাস প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং হাব সম্বন্ধে একটা গভীর রহস্যময় নীরবতা অবলম্বন করিতেছেন। ইহার কয়েক দিন পরেই সামান্য বিষয় লইয়া কাল রাত্রে আবার বিন্দুর সহিত ঝগড়া বাধিয়া গেল। নিতাইবাবু তাঁহার সঞ্চিত ক্রোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া কাঁচির সাহায্যে বিন্দুর খোঁপা নির্ম্মূল করিয়া দিলেন।

গাছের ডালে ঠেসান দিয়া বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে বিন্দুর লুপ্তবেণী মস্তকটির কথা স্মরণ হইতেই নিতাইবাবুর শুষ্ক মুখে একটু

হাসি দেখা দিল। আর যাহাই হোক, বিন্দুকে দস্তুরমত জব্দ করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য নিশ্চিন্ত—বিন্দু খোঁপা বাঁধিতে পারিবে না। নাঃ—বেড়া বিনুনিও নয়। খোঁপার জায়গাটায় মাংস বাহির হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, জঠরের বৃশ্চিকদংশন উত্তরোত্তব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিতাইবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। একটা কাঠবিড়ালী অনেকক্ষণ হইতে পাশেব একটা ডাল দিয়া ওঠানামা করিতেছিল, চোখে পড়িলেও নিতাইবাবু ভাল করিয়া লক্ষ্য কবেন নাই। কাঠবিড়ালীটা দ্রুতপদে যাতায়াত করিতে করিতে তাঁহার কাছাকাছি আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল, কালো কালো পেঁপের বিচির মত চোখ দিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কিচিমিচি শব্দে মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছিল। নিতাইবাবু এখন তাহার গতিবিধি চক্ষু দ্বারা অনুসরণ কবিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, কাঠবিড়ালী প্রত্যেক বার নীচে হইতে উপরে আসিবার সময় একটি ছোট্ট ফল মুখে করিয়া আনিতেছে এবং সেটিকে একটি কোটরের মধ্যে রাখিয়া আবাব ফিরিয়া যাইতেছে।

ক্ষুধাব সহিত কৌতূহল যোগ দিয়া নিতাইবাবুকে স্থির থাকিতে দিল না। তিনি ধীরে ধীরে নিজেব শাখা হইতে নামিয়া আসিয়া যে-শাখায় কাঠবিড়ালীর কোটর ছিল সেই শাখায় উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কোটরের কাছাকাছি পৌছিতে না পৌছিতে কাঠবিড়ালী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া উত্তেজিত ভাবে কিচিমিচি করিয়া উঠিল; নিতাইবাবু তবু উঠিতে লাগিলেন। কাঠবিড়ালী তখন বেগতিক দেখিয়া কোটব ছাড়িয়া পলায়ন করিল এবং বহু উর্দ্ধে

একটা সরু ডালে বসিয়া অবিশ্রাম নিতাইবাবুকে গালাগালি দিতে লাগিল।

নিতাইবাবু তাহার সমস্ত তিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়া কোটরের সম্মুখে শাখার দুই দিকে পা ঝুলাইয়া বসিলেন, কোটরে উঁকি মারিয়া দেখিলেন অন্ধকার, কিছু দেখিতে পাইলেন না। মারের ভয় ছাড়া অন্য কোনও ভয় নিতাইবাবুর শরীরে ছিল না, তিনি স্বচ্ছন্দে সেই অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিলেন। উপরে কাঠবিড়ালীর চেঁচামেচি ও গালিগালাজ আরও তীব্র হইয়া উঠিল।

কনুই পর্য্যন্ত হাত প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া নিতাইবাবু অনুভব করিলেন যে, তিনি কাঠবিড়ালীর বাসায় পৌঁছিয়াছেন, তুলার মত নরম তুল্‌তুলে একটি স্থান তাঁহার হাতে ঠেকিল। হাতড়াইতে হাতড়াইতে তিনি দেখিলেন, সেই নরম স্থানটিতে কাঠবিড়ালী তাহার রসদ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আর দ্বিধা না করিয়া এক খাম্‌চায় যতখানি পারিলেন সেই রসদ বাহির করিয়া আনিলেন।

কাঠবিড়ালী অতিশয় হিসাবী জন্তু। সন্তানসন্ততি এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই, বর্ষাকাল আসিতেও অনেক দেরী আছে, ইহারই মধ্যে সে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া অনাগত দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিতাইবাবু কোলের কাপড়ের উপর শুষ্ক ফলগুলি ঢালিয়া একে একে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেশীর ভাগই ছোট ছোট শুকনা ডুমুর, করমচা ও আরও কয়েক প্রকারের নামগোত্রহীন জংলী ফল। তাছাড়া কয়েকটা চীনাবাদাম, ছোলা ও কড়াইয়ের দানা পাওয়া গেল। সেগুলি নিতাইবাবু প্রাপ্তিমাত্র উদরসাৎ করিলেন। দু-তিনটা পুরাতন কাঁঠালবিচি ও হরীতকী ছিল, সেগুলি নিতাইবাবু একবার কামড়াইয়া থু থু করিয়া ফেলিয়া দিলেন। অখাদ্য।

কোটর হইতে আর এক খাব্‌লা বাহির করিয়া তিনি ক্ষুধিতভাবে পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু আর চীনাবাদাম কিংবা ছোলা পাওয়া গেল না। তাহার পরিবর্ত্তে তিনি একটি হারানো জিনিষ ফিরিয়া পাইলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার একটি কাচের রঙ্‌চঙা মার্ব্বেল হারাইয়া গিয়াছিল, সেটি রহিয়াছে দেখিলেন। নিতাইবাবু সেটি সযত্নে পকেটে পুরিলেন।

কাঠবিড়ালীটা তখনও ঊর্দ্ধে থাকিয়া তর্জ্জনগর্জ্জন ও লাফালাফি করিতেছিল, একটা কাঁটালবিচি তাহার উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া মারিয়া নিতাই-বাবু বলিলেন,—'চোর কোথাকার।' শব্দভেদী যুদ্ধে ক্রমশঃ অস্ত্রশস্ত্রের আমদানী হইতেছে দেখিয়া কাঠবিড়ালী রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

বিমর্ষভাবে আবার নিতাইবাবু স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। অপ্রচুর ইন্ধনে তাঁহার জঠরের অগ্নি আবার দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি শাখায় হেলান দিয়া ঊর্দ্ধমুখে ভাবিতে লাগিলেন, —এখন আত্মসমর্পণ করিলে মারের মাত্রা কিছু কমিবে কি-না? বেলা দুটা বাজিয়া গিয়াছে, সূর্য্যদেব মাথার উপর হইতে পাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন; গাছের ছায়া বৃক্ষতল ছাড়িয়া সরিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিতাইবাবু বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এখন বাড়ী ফিরিলে হয়ত অন্নের উপর দিয়া ফাঁড়াটা কাটিয়া যাইতে পারে। এত বেলা পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকার পর মা ও ঠাকুরমা নিশ্চয় তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, হয়ত প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ কাকার কানে না-উঠিতেও পারে। কিন্তু ওদিকে প্রতিহিংসাপরায়ণা বিন্দি আছে—সে ছাড়িবে না, নিশ্চয় কাকাকে খবর দিবে। তখন কি হইবে?

নিতাইবাবু গভীর নিঃশ্বাস মোচন করিলেন। এ অবস্থায় কি করা যায়।

হঠাৎ বাড়ী হইতে উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিতাইবাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কান খাড়া করিয়া শুনিলেন দরোয়ান গাড়ীবারান্দার তলায় দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—'ক্যঁহি নহি মিলা হুজুর। খোকাবাবু বিলকুল লা-পতা হো গয়ে।'

কাকাকে দেখা গেল না, কিন্তু তাঁহাব ভারী গলার আওয়াজ শোনা গেল,—'ক্যা বেওকুফ্‌কা মাফিক বোল্‌তা হ্যয়। লা-পতা হোকে কাঁহা যায়েঙ্গে ? জরুর কঁহি ছিপে হয়ে হ্যঁয়। মহল্লামে দেখা ?'

'জী হুজুর।'

'যাও, ফির্ আচ্ছি তরহসে খোজো।'

গাছের উপর নিতাইবাবু নিজমনে দাঁত খিঁচাইয়া হাসিলেন। এই দুপুর রৌদ্রে দরোয়ানটা তাঁহাকে মিছামিছি চারিদিক খুঁজিয়া বেড়াইতেছে অথচ তিনি হাতের কাছেই রহিয়াছেন, ভাবিতে বড় মধুব লাগিল। তিনি দেখিলেন, বিষণ্ণ ও বিরক্ত দরোয়ান আবার লাঠি হাতে বাহির হইতেছে।

বাড়ীর ফটক হইতে বাহির হইয়া দরোয়ান নিতাইবাবুব গাছেব ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। নাগরা জুতা খুলিযা ভিতরের ধুলা ঝাড়িয়া আবার পরিধান করিল, পাগড়ীর পুচ্ছ দিয়া মুখের ঘাম মুছিল, তারপর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কি বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল।

নিতাইবাবুর একবার ইচ্ছা হইল, দরোয়ানের মাথায় একটা কাঁটালবিচি কিংবা ঐ প্রকার কোনো দ্রব্য ফেলিয়া নিজের স্থিতিস্থান প্রকাশ করিয়া দেন। কিন্তু তিনি সে লোভ সংবরণ করিলেন। এত শীঘ্র আত্মপ্রকাশ করিলে চলিবে না। যদিও পেটের মধ্যে নেংটি ইঁদুর সবেগে ডন্ ফেলিতেছে, তথাপি ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। এখনও সময় উপস্থিত হয নাই।

দবোয়ান চলিয়া যাইবার কিয়ৎকাল পরে নিতাইবাবু দেখিলেন, ঠাকুরমা বাড়ির ছাদের উপর উঠিয়া আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাহিতেছেন। নিতাইবাবুর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, উৎসাহে তাঁহার মুখ দিয়া প্রায় বাহির হইয়া গেল—'ঠাকুমা, এই যে আমি এখানে।' কিন্তু 'ঠা—' পর্য্যন্ত বাহির হইতে-না-হইতে তিনি সবলে দাঁত দিয়া জিব কাটিযা ধরিলেন। সর্ব্বনাশ! আর একটু হইলেই সব ফাঁস হইয়া গিয়াছিল!

ঠাকুরমা কিছুক্ষণ নিতাইবাবুব দর্শনাশায ছাদের এদিক-ওদিক হইতে ব্যাকুলভাবে উঁকি মারিয়া অবশেষে নীচে নামিয়া গেলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, নিতাইবাবু সতৃষ্ণনয়নে সেইদিকে তাকাইযা রহিলেন। তারপর আবার ধীরে ধীরে ঠেসান দিয়া শুইলেন।

বাড়িতে যে বেশ একটা সাড়া পড়িযা গিযাছে তাহার নিদর্শন মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছিল। ঝি-চাকরগুলা অনবরত ভিতর-বার করিতেছিল। কাকা জলদগম্ভীর স্বরে মধ্যে মধ্যে তাহাদেব ধমকাইতেছিলেন; একবার ঠাকুরমার সঙ্গে কাকার কথা-কাটাকাটি হইল—সে আওয়াজও অস্পষ্টভাবে নিতাইবাবুব কানে পৌঁছিল। শেষে বেলা যখন চারটা বাজিয়া গেল তখন কাকা স্বয়ং খোঁজ করিতে বাহির হইলেন। নিতাইবাবু উপর হইতে গলা বাড়াইয়া তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত উদ্বিগ্ন মুখ দেখিয়া মনে মনে বেশ তৃপ্তি অনুভব করিলেন, আশা হইল আরও কিছুক্ষণ এইভাবে অজ্ঞাতবাস চালাইতে পারিলে হযত প্রহারের পালাটা একেবারে বাদ পড়িতেও পারে।

তিনি পুনশ্চ কোমরের কসি টান করিয়া দিয়া, চক্ষু মুদিয়া পা দুলাইতে লাগিলেন। শরীর কিছু নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, মাথার

উপর মৌচাক হইতে মৌমাছিদের একটানা গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাঁহার ঈষৎ তন্দ্রাকর্ষণ হইল।

তন্দ্রার ঘোরে তিনি দেখিতেছিলেন, কোন অভাবনীয় উপায়ে একটা জীবন্ত কাঠবিড়ালী তিনি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিয়াছেন, সেটা পেটের মধ্যে গিয়া নখ দিয়া তাঁহার অভ্যন্তরভাগ আঁচ্‌ড়াইতেছে ও তাঁহাকে বাপান্ত করিতেছে। এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় নিতাইবাবু ছুটিতে ছুটিতে ঠাকুরমার কাছে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ঠাক্‌মা বড্ড খিদে পেয়েছে!' ঠাকুরমা তাঁহাকে কোলে লইয়া বসিতেই কাঠবিড়ালীটা তাঁহার দক্ষিণ কর্ণের ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ থালা কোথা হইতে সম্মুখে উপস্থিত হইল। নিতাইবাবু ভারী আনন্দিত হইলেন। শত্রুপক্ষ কেহ কাছে নাই; ঠাকুরমা সযত্নে অন্নব্যঞ্জন মাখিয়া নিতাইবাবুর ব্যাদিত মুখে গ্রাস দিতে যাইতেছেন এমন সময় নীচে হইতে কর্কশ গলার আওয়াজে তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

নিতাইবাবু চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, সূর্য্য একেবারে পশ্চিম দিগন্ত রেখা স্পর্শ করিয়াছে এবং তাহার তির্য্যক্ রশ্মিতে যে ডালে তিনি ছিলেন তাহা আগাগোড়া আলোকিত হইয়াছে!

নীচে দৃষ্টিপাত করিলেন, দরোয়ান ও বাড়ির একটা ঝি দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে দৃষ্টিগোচর হইল।

দরোয়ান বলিল,—'ঐসা বিচ্ছু লড়কা কভি নেই দেখা। দেখো তো, সবেরে উঠ্‌কে ভাগা আভিতক্ পতা নই! খোজ্‌তে খোজ্‌তে হমারা নাকমে দম আ গিয়া, দিনভর খানা পিনা কুছ নহি—'

ঝি বলিল,—'সত্যি বাপু, অমন ছেলেও দেখিনি কখনও—গিন্নিমা সমস্ত দিন মুখে জল পর্য্যন্ত দেন নি,—বিন্দুদিদি ত কেঁদেকেটে শুয়ে আছে! আচ্ছা, কি বজ্জাত ছেলে বল দিকিন্ দরোয়ানজী, থোঁপাটি

মুড়িয়ে কেটে দিলে গা? একটু মায়া হ'ল না? না বাপু, ও ছেলের রকম-সকম মোটে ভাল নয়, যত বয়স বাড়ছে ততই যেন—'

দরোয়ান তিক্ত স্বরে বলিল,—'আরে দাই, হম্ বোল্‌তে হেঁ, তুম খেয়াল রাখনা, ই লড়কা বড়া হোকে ডাকু বনেগা—বম্ গোলা ছোড়েগা! ইয়াদ হ্যয়? উস্-দিন রাত আঠ বজে চারপাই পর শো কর হমারা থোড়া নিদ্ আ গিয়া থা। লৌণ্ডা কিয়া কা—চুপসে হমারা টিক্‌মে ডোরি বাহ্‌কে চারপাইকা পায়াসে বাহ্‌ দিয়া। উস্‌কে বাদ ছোটে ভইয়াকো যাকে খবর দে দিয়া। ব্যস্, ছোটে ভইয়া জোরসে ফুকারিন, হম্‌ভি হড়বড়াকে উঠা—'

সহানুভূতিপূর্ণস্বরে ঝি বলিল,—'আহা মরে যাই। হেঁচকা লেগে টিকি ত তোমার সেদিন প্রায় উপড়ে গিয়েছিল। তারপর ছোটবাবু কত মারলেন, মার ত লেগেই আছে—কিন্তু তবু কি বজ্জাতি কমে—'

দরোযান বলিল,—'লড়কা না লড়কেকা দুম্! ছোটে ভৈয়াকা মার সে কুছ নেহি হোগা, হম্‌কো একদফি সরকারসে হুকুম মিল যায়, হম্ ডাণ্ডাসে লৌণ্ডেকা বদমাসি নিকাল দেঁ—'

লৌণ্ডা! লড়কেকা দুম্! এ পর্য্যন্ত নিতাইবাবু কোন রকমে সহ্য করিয়া ছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না। সক্রোধে পকেট হইতে সেই পুনঃপ্রাপ্ত মার্ব্বেলটা বাহির করিয়া দরোয়ানের মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন।

নিতাইবাবুর লক্ষ্য ব্যর্থ হইবার নয়, মার্ব্বেল দরোয়ানের পাগড়ীর মধ্যস্থিত মুক্ত স্থানটিতে আসিয়া লাগিল, খট্ করিয়া একটি শব্দ হইল। দরোয়ান শূন্যে প্রায় চার হাত লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—'বাপ রে! জান গিয়া!' তারপর ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উত্তেজিত রাসভের মত চীৎকার করিতে লাগিল,—'উয়্‌হ বৈঠা! পকড়া হ্যয়! ছোটে ভৈয়া,

জলদি আইয়ে, খোখাবাবু পেঁড় পর বৈঠা হ্যায়!—হমারা শির ফোড় দিয়া! জল্‌দি আইয়ে—পকড়া হ্যায়!'

ঝি বৃক্ষাসীন নিতাইবাবুর হিংস্র মূর্ত্তি দেখিয়াই জিব কাটিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমেষে বাড়িতে যে যেখানে ছিল আসিয়া বৃক্ষতলে জমা হইল, বাবা কাকা হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ির দেড় বছরের ছেলেটা পর্য্যন্ত কেহই বাদ গেল না। নিতাইবাবু দেখিলেন, মুহূর্ত্তের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাঁহার পলায়নের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি ডালের উপর আর এক ধাপ উঠিয়া বসিলেন।

কাকা হাতের চাবুক আস্ফালন করিয়া বলিলেন,—'নেমে আয়।'

নিতাইবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—'নামব না।'

কাকা রুদ্র কণ্ঠে কহিলেন,—'শিগ্‌গীর নেমে আয় বল্‌ছি হনুমানের বা—' বলিয়াই থামিয়া গেলেন। বাবা মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিলেন।

নিতাইবাবু বলিলেন,—'আগে বল মারবে না, তবে নামব।'

'মারব না? তোকে আজ জ্যান্ত মাটিতে পুঁতব। নাম্‌ শিগগীর।'

'তবে নামব না।'

'নামবি না? আচ্ছা, দাঁড়া তবে। এই বুদ্ধু সিং, গাছ পর চহ্‌ড়ো, কান পকড়কে উস্‌কো উতার লে আও!'

নিতাইবাবুর কান পাকড়িয়া নামাইয়া আনিবার প্রস্তাবটা খুব মুখরোচক হইলেও বুদ্ধু সিং দরোয়ানের তাদৃশ উৎসাহ দেখা গেল না। তাহার মস্তকের কেশবিরল মধ্যস্থলটি সুপারির মত ফুলিয়া উঠিয়াছিল, সে উর্দ্ধে একটি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ক্ষীণভাবে বলিল,—'জী হুজুর।'

নাগরা ও পাগড়ি খুলিয়া রাখিয়া দরোয়ান গাছে চড়িতে প্রবৃত্ত হইল। নিতাইবাবু প্রমাদ গণিলেন। এবার ত আর রক্ষা নাই।

হঠাৎ তাঁহার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। তিনি উপর দিকে উঠিতে উঠিতে বলিলেন,—'বুদ্ধু সিং, হামারা পাস আওগে ত হাম্‌ভি এই চাক্‌ মে খোঁচা দেঙ্গে। তুম্‌ হাম্‌কো লৌণ্ডা বোল্‌কে গালি দিয়া থা—হাম্‌ভি তুমকো মজা দেখাবেঙ্গে।'—বলিয়া মাথার ইঙ্গিতে প্রকাণ্ড চাকটা দেখাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

দরোয়ান খানিকটা দূর উঠিয়াছিল, পিছলাইয়া নামিয়া আসিল; বলিল,—'হম্‌সে নেহি হোগা হুজুর! মধ্‌মচ্ছিকা খোঁতা হ্যয়—জান্‌ চলা যাগা।'

এই ক্ষুদ্র বালকের কূটবুদ্ধি দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

ওদিকে নিতাইবাবুও স্তম্ভিত হইয়া মৌচাকের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। এমন অভাবনীয় ব্যাপার যে ঘটিতে পাবে তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। অস্তমান সূর্য্যের আলো পাতার ফাঁক দিয়া মৌচাকের উপর পড়িয়াছিল, মক্ষিকাপূর্ণ চাকটা অভ্রের মত আলোক প্রতিফলিত করিতেছিল। নিতাইবাবু বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন, ঠিক তাহারই এক হাত দূরে স্থূল শাখার রুক্ষ গায়ে আটকাইয়া ঝুলিতেছে—বিন্দুর সেই হারানো সোনার হার! সোনার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া চিক্‌চিক্‌ করিতেছে, চিনিতে নিতাইবাবুর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। ইহা সেই হার যাহা তিনি কয়েকদিন পূর্ব্বে গুড়ের বাটিতে ডুবাইয়া মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। এতক্ষণ কেবল ওই স্থানটা অন্ধকার ছিল বলিয়াই উহা চোখে পড়ে নাই।

কাঠবিড়ালী, কাক, পিপীলিকা প্রভৃতি ইতরপ্রাণীর আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে নিতাইবাবুর প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা ছিল, সুতরাং কি করিয়া হারছড়া বৃক্ষের উচ্চ শাখায় আসিয়া দোদুল্যমান হইল তাহা অনুমান করিতে তাঁহার কষ্ট হইল না। তিনি বুঝিলেন মিষ্টান্নলুব্ধ কোনো ইতরপ্রাণীই এই কুকার্য্য করিয়াছে।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া নিতাইবাবু বিজয়োল্লাসে হাস্য করিলেন ; আজিকার যুদ্ধে এরূপ ভাবে ঘেরাও হইয়াও অবশ্যম্ভাবী পরাজয়কে তিনি যে অচিরাৎ সম্মানসূচক সন্ধিতে পরিণত করিতে পারিবেন তাহাতে আর সংশয় রহিল না।

নিম্নাভিমুখে তাকাইয়া তিনি বলিলেন,—'একটা জিনিষ পেযেছি, বল্‌ব না।'

কাকা কথায় ভুলিবার লোক নয়, তিনি বলিলেন,—'বটে ? জিনিষ পেয়েছ ! আচ্ছা, আগে গাছ থেকে নেমে এস ত দেখি।'

'আগে বল মার্‌বে না।'

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি জিনিষ পেয়েছিস্ ?'

একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিতাইবাবু বলিলেন,—'বিন্দির হার।'

বিন্দু উপস্থিত ছিল, শুনিবামাত্র সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'আমার হার ! ও কাকা, শীগ্‌গীর আমার হার দিতে বল।'

কাকা প্রশ্ন করিলেন,—'হার কোথায় পেলি ?'

'বলব না। আগে বল মারবে না।'

কাকা বিবেচনা করিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা, কম মারব। তুই হার নিয়ে নেমে আয়।'

'তবে নামব না। হারও দোব না।'

বিন্দু বলিল,—'ও কাকা—'

কাকা ও বাবা নিম্নস্বরে পরামর্শ করিলেন, তারপর কাকা দুঃখিত ভাবে বলিলেন,—'আচ্ছা আয়, মারব না।'

নিতাইবাবুর সন্দেহ হইল ইহার মধ্যে আইনের ফাঁকি আছে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'থাপ্পড় ?'

'না—থাপ্পড়ও মারব না।'

'কানমলা ?'

'না।'

'আচ্ছা, তবে যাচ্ছি।'

'হার নিয়ে আস্‌বি, তা না হ'লে—'

সন্ধির সর্ত্ত রীতিমত পাকা করিয়া লইয়া নিতাইবাবু হারটি উদ্ধারের চেষ্টায় যত্নবান হইলেন। সূর্য্যাস্ত হইয়া গিয়াছিল, অতএব মৌমাছিদের দিক হইতে আশঙ্কার বিশেষ কারণ ছিল না। নিতাইবাবু গুটি গুটি অতি সাবধানে মৌচাকের নিকটবর্ত্তী হইলেন। মৌমাছি জাতিটা অতিশয় স্নায়ুপ্রধান, একটুতেই চটিয়া যায়, ইহা নিতাই বাবুর জানা ছিল; তিনি একটি চক্ষু চাকের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া হারের দিকে অগ্রসর হইলেন। নীচে যাহারা ছিল তাহারা বিশ হাত ঊর্দ্ধে হারটা দেখিতে পায় নাই, কেবল এই দুঃসাহসিক বালকের গতিবিধির দিকে চাহিয়া নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

চাক নিস্তব্ধ, মৌমাছিদের বোধ করি তন্দ্রা আসিয়াছে। নিতাইবাবু হারের নাগালে আসিয়া আস্তে আস্তে হাত বাড়াইলেন। ভোঁ—! একটা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন উঠিল। কয়েকটা মৌমাছি চাক হইতে উড়িয়া একবার পরিক্রম করিয়া আবার চাকে গিয়া বসিল। নিতাইবাবু বিদ্যুদ্বেগে হাত টানিয়া লইয়াছিলেন, কিছুক্ষণ নিশ্চল মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন।

আবার চাক নিস্তব্ধ—মৌমাছিরা নিশ্চয় নিদ্রালু। নিতাইবাবু

পুনরায় ধীরে ধীরে হাত বাড়াইলেন। হারটা গাছের কর্কশ ত্বক হইতে ছাড়াইতে একটু শব্দ হইল— অমনি ভণ্‌ণ্‌! তিনটা মৌমাছি তাঁহাকে আক্রমণ করিল। একটা ঠিক নাকের ডগায় হুল ফুটাইয়া দিল, অন্য দুটা দুই গণ্ডে দংশন করিয়া আবার ফিরিয়া গিয়া চাকে বসিল।

নিতাইবাবুর নাসিকা ও গণ্ডদ্বয় আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত বসিয়া রহিলেন। একটু নড়িলে যে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় থাকিবে না, চাক হইতে কোটি কোটি অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ মৌমাছি আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নেহাৎ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহারা সদলবলে বাহির হইতেছে না, কিন্তু আর বেশী ঘাঁটাইলে সন্ধ্যার দোহাই মানিবে না। তখন তাহাদের হুলের জ্বালায় না হোক এই বিশ হাত উচ্চ হইতে মাটিতে পড়িলে মৃত্যু অনিবার্য্য। অপরিসীম সহিষ্ণুতা সহকারে নিতাইবাবু আরও দু-মিনিট সেইভাবে বসিয়া রহিলেন। তারপর চাক যখন একেবারে নিঃশব্দ হইয়া গেল তখন তিল তিল করিয়া পিছু হটিয়া নামিতে আরম্ভ করিলেন।

পাঁচ মিনিট পরে, অন্ধকারপ্রায় বৃক্ষতলে নিতাইবাবু যখন নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বাবা এবং কাকা চমকিয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—'এ কি! এ আবার কে?'

নিতাইবাবুর নাসিকা ও গাল দুটি এরূপ বিপর্য্যয় ফুলিয়া উঠিয়াছিল যে, উপস্থিত কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

* * * *

রাত্রে বিছানায় শয়ন করিয়া দুই ভাইবোনে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তারপর বিন্দু আস্তে আস্তে বলিল,—'নিতাই, বড্ড ব্যথা করছে— না রে?'

নিতাইবাবু বলিলেন,—'হুঁ।'

বিন্দুর মনে আর রাগ ছিল না, সে বিগলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'নাকে একটু হাত বুলিয়ে দেব ভাই?'

নিতাইবাবুর নাকটি মাঝারি-গোছের শাঁকআলুর আকার ধারণ করিয়াছিল, গণ্ডের স্ফীতিবশতঃ চোখ দুটিও প্রায় বুজিয়া গিয়াছিল; তিনি ক্রন্দনের প্রবল আবেগে ঢোক গিলিয়া বলিলেন,—'হুঁ।'

বিন্দু তাঁহাকে জড়াইয়া লইয়া সযত্নে নাকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল,—'কেন ভাই, তুই আমার চুল কেটে নিলি? তাই ত ভগবান রাগ ক'রে তোর নাক অমন ক'রে দিলেন।'

অনুতপ্ত ভাবে নিতাইবাবু বলিলেন,—'আর করব না।'

মানুষকে বুদ্ধিবলে পরাস্ত করিলেও দৈবী প্রতিহিংসার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যে অসম্ভব তাহা নিতাইবাবুর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল।

বিন্দু সস্নেহে তাঁহার স্ফীত রক্তিম গণ্ডে একটি চুম্বন করিয়া বলিল,—'লক্ষ্মী ভাই, আর কখ্‌খনো করিস নি।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাইবাবু বলিলেন,—'দিদি, তোর চুল আবার গজাবে।'

চুলের কথা নূতন করিয়া স্মরণ হইতেই দিদির দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু সে উদ্গত অশ্রু গিলিয়া ফেলিয়া বলিল,—'হ্যাঁ। তোর নাকও আবার ঠিক হয়ে যাবে, এবার ঘুমো।'

তারপর দুই ভ্রাতা-ভগিনী নিবিড় ভাবে পরস্পরের গলা জড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

১২ চৈত্র ১৩৩৯

শীলা-সোমেশ

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামক সর্ব্ববিদিত পথটি সাঁওতাল পরগণার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে যে ক্ষুদ্র সহরটিকে দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দিয়া ঊর্দ্ধমুখে চলিয়া গিয়াছে সেই সহর হইতে প্রায় দশ এগারো মাইল উত্তরে পথের ধারেই একটা বাংলো বাড়ী দেখা যায়। ঘন সন্নিবিষ্ট শালবনের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়া প্রায় বিঘা দুই জমি ঘেরা, তাহারই মধ্যস্থলে উচ্চ ভিত্তির উপর বাড়ীখানি প্রতিষ্ঠিত। আশে-পাশে দু'দশ মাইলেব মধ্যে কোথাও জনমানবের বাস নাই।

সন্ধ্যার পর নিবিড় জঙ্গলের ছায়ায় যখন পথের শুভ্র রেখাটি মুছিয়া মিলাইয়া যায় এবং বাংলোটির ঘরে ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠে তখন দিগব্যাপী স্তব্ধতার মধ্যে জঙ্গলেব নানাপ্রকার শব্দ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। শালের পাতায় পাতায় ঘষিয়া যে মর্ম্মর ধ্বনি উত্থিত হয় তাহার সহিত সহসা 'খট্টাসের' অট্টহাসি মিশিয়া বিশ্রদ্ধ মনকে চমকিত সন্ত্রস্ত করিয়া দেয়। কখনও বা গভীর রাত্রে অতি সন্নিকটে ব্যাঘ্রেব আকস্মিক গর্জ্জন নিদ্রিত গৃহবাসীকে শয্যার উপর উঠিয়া বসাইয়া দেয়। তখন বাড়ীর রক্ষক কুকুরগুলার ঘেউ ঘেউ শব্দের সদম্ভ আস্ফালন যেন মার খাইয়া থামিয়া যায়।

চন্দ্রনাথ রায, ফরেষ্ট অফিসার, এই বাংলোতে বাস করেন। বাড়ীর পশ্চাতে তারের বেড়ার ধারে যে একসারি ছোট ছোট কুঠুরী আছে তাহার একপ্রান্তের কয়েকটি ঘরে তাঁহার অফিস বসে ও গুটি তিন-চার কর্ম্মচারী বাস করে। অপর দিকে আস্তাবল ও সহিসের ঘর। চন্দ্রনাথ-

বাবুর একটি ঘোড়া ও টম্‌টম্‌ আছে, ঘোড়াটি সোয়ারী ও টম্‌টম্‌ দুই কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়। সাঁওতাল সহিস সপরিবারে এইখানেই থাকে। বাড়ীর যৎসামান্য কাজের জন্য একটি দাই ও একজন বেয়ারা আছে। বেয়ারা একাধারে ভৃত্য এবং পাচক।

এ সকল ছাড়াও চন্দ্রনাথবাবুর একটি কন্যা আছে—তাহার নাম শীলা। সে-ই সংসারের কর্ত্রী, কারণ চন্দ্রনাথবাবু বিপত্নীক। শীলার বয়স আঠারো বৎসর। মেয়েটি দেখিতে সুন্দর, ছোট-খাটো, ক্ষীণাঙ্গী, সহসা দেখিলে নেহাৎ বালিকা বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে মুখের কোমল সৌকুমার্য্যের ভিতর দিয়া বয়সোচিত দৃঢ় চিত্তবল ও স্বনির্ভরতা ধরা পড়ে।

কন্যাটিকে লইয়া চন্দ্রনাথবাবু নিশ্চিন্তমনে অরণ্যবাস করিতেছেন। চিরজীবন এইভাবেই কাটিয়াছে; তাই মানুষের সঙ্গের প্রতি বড় একটা লিপ্সা নাই। শীলাও তাঁহার মত—একলা থাকিতে ভালবাসে। কদাচ দু'মাস ছ'মাসে পিতাপুত্রী টম্‌টম্‌ আরোহণে সহরে গিয়া বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। তারপর আবার নিরবচ্ছিন্ন বনপর্ব্ব চলিতে থাকে।

ভাদ্রমাস কাটিয়া গিয়াছে, আশ্বিনের আরম্ভ। সন্ধ্যার পর হিম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, শেষরাত্রিতে একটু গা শীত-শীত করে। দিনের বেলাটি শীত-গ্রীষ্ম বিবর্জ্জিত একটী মনোরম সন্ধিকাল। নির্ম্মল আকাশ ও ঝরঝরে বাতাস যেন প্রকৃতির সমস্ত আসবাব ঝাড়িয়া মুছিয়া একেবারে ক্লেদমুক্ত করিয়া দিয়াছে—গাছের পাতায় কি আকাশের লঘু মেঘে কোথাও এতটুকু মলিনতার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

বাংলোর সম্মুখে খানিকটা স্থান লইয়া গোলাপের বাগান। বৈকালী সূর্য্যের সঙ্কুচিত রশ্মি বাগানটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। হাতে

একটা খুরপী লইয়া শাড়ীর আঁচলটা গাছ-কোমর করিয়া বাঁধিয়া শীলা গোলাপ গাছের তত্ত্বাবধান করিতেছিল। যে গাছে তখনও ফুল ধরে নাই তাহার গোড়া খুঁড়িয়া দিতেছিল, আবার যে গাছটি ফুলে মুকুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, একটি ক্ষুদ্র জল ঢালিবার ঝাঁঝ্‌রিদার পাত্র হইতে তাহার পাতায় ও মূলে জল দিতেছিল। মালী নাই, এ বাগানটি শীলার নিজের হাতে তৈয়ারী—নিজস্ব। তাই ইহার প্রতি তাহার যত্ন ও মমতার অন্ত ছিলনা। একটি ফুলও সে প্রাণ ধরিয়া কাহাকেও ছিঁড়িতে দিতে পারিত না।

শীলা মন দিয়া বাগানের সেবা করিতেছিল বটে কিন্তু তাহার একটি চোখ ও একটি কাণ পথের পানে পড়িয়াছিল! মাঝে মাঝে যেন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিবার উদ্দেশ্যেই গেটের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেছিল এবং কাঠের ফাটকেব উপর ভর দিয়া পথের যে প্রান্তটা সহরের দিকে গিয়াছে, সেইদিকে উৎসুক চোখে চাহিয়া দেখিতেছিল।

চন্দ্রনাথবাবু বেলা দ্বিপ্রহরে ঘোড়ায় চড়িয়া বন্দুক ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। কিন্তু ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, রোজই চন্দ্রনাথবাবুর ফিরিতে সন্ধ্যা হয় সুতরাং সেজন্য উৎকণ্ঠার কোনও হেতু নাই। শীলার চিত্ত-চাঞ্চল্যের অন্য কারণ ছিল। আসল কথা আজ শনিবার।

আষাঢ় মাসে আকাশে নবীন মেঘোদয় দেখিয়া তরুণীদের মন উন্মনা হয়, এ দেশের প্রাচীন কবিরা এরূপ একটা কথা লিখিয়া গিয়াছেন বটে, তাহাও পথিক-বধূ জাতীয় বিশেষ এ-শ্রেণীর তরুণীদের সম্বন্ধে! কিন্তু শনিবারে, আকাশ একান্ত নির্ম্মেঘ থাকা সত্ত্বেও এরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা কোন কাব্যে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কবিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দক ভর্তৃহরি কবিও শনিবারের নামে এমন একটা

অভিযোগ আনিতে সাহস করেন নাই। তবে আজ কেবলমাত্র শনিবার বলিয়া একটি অনূঢ়া তরুণী গোলাপ গাছের পরিচর্য্যা করিতে তৃষিত নয়নে বনপথের পানে চাহিয়া থাকিবে কেন ?

গত কয়েকটি শনিবার হইতেই এই ব্যাপার ঘটিতেছিল। মাস দুয়েক পূর্ব্বে চন্দ্রনাথবাবু সকন্যা সহরে গিয়াছিলেন, সেখানে এক পুরাতন বন্ধুর গৃহে একটি নূতন লোকের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। লোকটি সহরে নবাগত, বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্বাস্থ্যের জন্য হাওয়া বদলাইতে আসিয়া মস্ত একখানা কম্পাউণ্ডযুক্ত বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিল। পুরাতন বন্ধুটি পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইনি সোমেশ বসু, ধনীর সন্তান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এবং অতিশয় সজ্জন। অধিকন্তু লোকটি যে বিশেষ সুপুরুষ তাহা চন্দ্রনাথবাবু ও তাঁহার কন্যা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিলেন। শীলা মনে মনে বয়স আন্দাজ করিল—ছাব্বিশ সাতাশ।

সোমেশ বসুর সহিত আলাপে আরও একটা জিনিষ প্রকাশ পাইল, সে অতি শীঘ্র আবালবৃদ্ধবনিতার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারে। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সে এতই ভাব জমাইয়া তুলিল এবং এমন ভাবে আচরণ করিতে লাগিল যেন চন্দ্রনাথবাবু তাহার খুড়া-জ্যাঠা জাতীয় একজন নিকট আত্মীয় এবং শীলা তাহার শৈশবের সহচরী—কেন যে তাহাকে এখনও 'সোমেশদা' বলিয়া বিগলিত কণ্ঠে ডাকিতেছে না ইহাই যেন ভারী আশ্চর্য্যের বিষয় !

সেইদিন সায়াহ্নে সোমেশ বসুর বাড়ীতে চা পান করিয়া তাহার বড় দিদির নির্ম্মিত অপূর্ব্ব জিভে-গজার স্বাদ মুখে লইয়া শীলা ও তাহার পিতা বাড়ী ফিরিলেন। বিদায়কালে সোমেশ আশ্বাস দিয়া বলিল,—'কিছু ভাববেন না, শনিবারে শনিবারে গিয়ে আমি আপনাদের নির্জ্জন বাসের ক্লেশ লাঘব করে দিয়ে আসব।'

এই আত্মপ্রত্যয়শীল যুবকের কথা বলিবার গম্ভীর ভঙ্গী দেখিয়া শীলার বড় হাসি পাইয়াছিল।

তাহার পর হইতে প্রতি শনিবারে সোমেশ বাইসিক্‌ল্ আরোহণে চন্দ্রবাবুর বাংলোতে আসিয়াছে এবং ঘণ্টা দুই থাকিয়া চা সেবন ও শীলার স্বহস্ত প্রস্তুত কেক্ ভক্ষণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি শীলার মনে একটা গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। সোমেশের স্বাস্থ্যপূর্ণ দৃঢ় শরীর, তাহার সুশিক্ষা-মার্জ্জিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহার কথা বলিবার হাল্কা অথচ গম্ভীর ভঙ্গী সবই শীলার ভাল লাগে এবং লোকটি যে খুব ভাল এ বিষয়েও তাহার মনে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সকল কথাবার্ত্তা আচরণের অন্তরালে যে একটি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় অজ্ঞাতসারে পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহা শীলার ভাল লাগে না। ইহা যদি অহমিকা বা আত্মম্ভরিতা হইত তাহা হইলে দু'চারিটি তীক্ষ্ণ কথার বাণে শীলা তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু ইহা সে বস্তু নহে, প্রকৃত পক্ষে ইহার কতখানি ঠাট্টা এবং কতখানি সত্য মনোভাব তাহাই শীলা অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সে নিজে শৈশব হইতে আত্মনির্ভরশীলা, সর্ব্ববিষয়ে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থা, কাহারও মুরুব্বিয়ানা বা পৃষ্ঠপোষকতা সে আদৌ সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু সোমেশের ভাবে-ইঙ্গিতে যেন ঐ বস্তুটারই সে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পায়। এবং এই আত্মপরিতোষ যতই তাহার মর্য্যাদায় আঘাত করিয়া যায়, আঘাত ফিরাইয়া দিতে না পারিয়া ততই সে উৎপীড়িত হইয়া উঠে।

তাছাড়া, বাড়ীতে চন্দ্রনাথবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া চাকরাণীটা পর্য্যন্ত সোমেশের গুণগানে এমনি মুক্তকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন যে, একজন কেহ প্রতিবাদ না করিলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বৈচিত্র্যহীন

বন্দনা-গীতি হইয়া দাঁড়ায়। তাই সুযোগ পাইলেই সে পিতার সহিত তর্ক করে, যে, সোমেশবাবু লোকটি অতিশয় অহঙ্কারী এবং উচ্চনীচ সকলকেই পিঠ ঠুকিয়া পেট্রনাইজ করা তাঁহার স্বভাব

প্রত্যুত্তরে চন্দ্রনাথবাবু বলেন যে, যুবকদের নিরীহ অতিবিনয়ী ভাব তিনি সহ্য করিতে পারেন না এবং আজকালকার ছেলেরা অতিশয় শিষ্ট ও মিষ্টভাষী হইয়া একবারে উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে।

শীলা তর্ক করে যে, সোমেশবাবু সকলকেই মনে মনে তাচ্ছিল্য করিয়া ক্ষুদ্র করিয়া দেখেন। চন্দ্রবাবু বলেন, না, সে নিজেকে সকলের সমান করিয়া দেখে।

সুতরাং তর্কের নিষ্পত্তি হয় না। নিজের যুক্তির প্রভাবে শীলা সোমেশের প্রতি বিমুখ হইয়া বসিতে চাহে, তাহাকে অবহেলা করিয়া মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু পারে না, অদৃশ্য আকর্ষণ দৃঢ়তর হইতে থাকে। এইরূপ দোটানার মধ্যে তাহার রাত ও দিনগুলা কাটিতেছে।

নিস্তব্ধ বাতাসে বহুদূর হইতে সুমিষ্ট কিড়িং কিড়িং শব্দ ভাসিয়া আসিল। শীলা সচকিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল তখনও পথের উপর সাইক্ল্ বা তাহার আরোহীকে দেখা যাইতেছে না। সে বাগানে ফিরিয়া গিয়া পীতপুষ্পনম্র একটি গোলাপলতার মঞ্চমূলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গভীর মনসংযোগে তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সোমেশ আসিয়া ফটকের সম্মুখে অবতরণ করিল; ফটকের গায়ে বাইসিক্ল্ হেলাইয়া রাখিয়া হাতার ভিতর প্রবেশ করিল। শীলা একমনে এতই কাজ করিতেছিল যে, তাহার অভ্যাগম জানিতে পারিল না।

সোমেশের পায়ে রবার সোল্ জুতা ছিল, তাই সে যখন নিঃশব্দে

শীলার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল, তখনও শীলা মুখ তুলিয়া চাহিল না। কিন্তু হেঁট হইয়া কাজ করিতেছিল বলিয়াই বোধ হয় তাহার ঘাড় ও কর্ণমূল ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিল।

মিনিট দুই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সোমেশ মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। শীলা যেন চমকিয়া মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল, সেও একটুখানি স্বাগত হাসি হাসিয়া বলিল,—'এই যে! কতক্ষণ এসেছেন?'

সোমেশের অধরোষ্ঠ একবার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইল। সে বলিল,—'প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন। কতক্ষণ এসেছি তা তুমি বিলক্ষণ জান।'

শীলা আবার ঘাড় গুঁজিয়া গোলাপ গাছে মন দিল, যেন সোমেশের কথা শুনিতেই পায় নাই। কিন্তু তাহার মুখ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও লাল ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এই লোকটি কথায় কথায় মানুষকে এমন অপ্রস্তুত করিয়া দিতে পারে যে সহসা মুখে কথাই যোগায় না। তা ছাড়া, এতদিন সে শীলাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছিল, আজ হঠাৎ কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই 'তুমি' বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল দেখিয়া শীলার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল।

শীলার মুখ সোমেশ দেখিতে পাইতেছিল না শুধু তাহার মাথার ঘন চুলের মধ্যে সিঁথির ঋজু রেখাটি সোমেশের চোখের নীচে একটি কাননমধ্যবর্ত্তী সুন্দর বীথিপথের মত জাগিয়া ছিল। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া সোমেশ মুখ টিপিয়া একটু হাসিল, তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল,—'এলো খোঁপা বাঁধ্‌লে তোমাকে বেশ দেখায়।'

এবার শীলা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা না বলিয়া গাছ হইতে শুষ্ক পাতাগুলা ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল।

সোমেশ হাত বাড়াইয়া একটি আধ-ফুটন্ত ফুল বোঁটাসুদ্ধ ছিঁড়িয়া লইল। শীলা এতক্ষণে একটা সত্যকার সুযোগ পাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দিকে ভ্রূকুটীপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিল,—'আমার গাছ থেকে ফুল ছিঁড়লেন যে?"

সে কথার উত্তর না দিয়া, ফুলের দীর্ঘ আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া সোমেশ বলিল,—'আঃ! চমৎকার গন্ধ! মার্শালনীল বুঝি?—একবার উঠে দাঁড়াও তো, তোমার খোঁপায় গুঁজে দি।'

বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শীলা বলিল,—'সোমেশবাবু!'

মৃদু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সোমেশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, —'কি হল?'

ক্রুদ্ধস্বরে শীলা বলিল,—'আজ এ সব আপনি কি বলছেন? জানেন বাবা বাড়ী নেই?'

সোমেশ সহজভাবে বলিল,—'জানি। তিনি ডন্‌কুইক্সোটের মত সাজ করে বেরিয়েছেন, পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মাইল খানেক পথ তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে এলুম—তারপর তিনি আবার অশ্বপৃষ্ঠে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তোমাকে খবর দিতে বল্লেন, আজ তাঁর ফিরতে দেরী হবে। কোথায় নাকি একটা বাঘের সন্ধান পেয়েছেন।'

রাগে শীলা একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। ডন্‌কুইক্সোটের মত!

সোমেশ পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিল,—'তোমার বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে একটা মজার ইতিহাস বেরিয়ে পড়ল; আমার বাবা এবং তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে একসঙ্গে ইডেন্ হিন্দু হোষ্টেলে ছিলেন,—দু'জনের মধ্যে ঘোর বন্ধুত্ব ছিল। ঠিক করেছি, তোমার বাবাকে এবার থেকে 'কাকাবাবু' বলে ডাকব। ইতিমধ্যে একবার ডেকেও নিয়েছি।'

কথা কহিবার ধরণ যাহার এইরূপ তাহার প্রতি কতক্ষণ রাগ করিয়া

থাকা যায়? কিন্তু শীলা তাহার পুরাতন অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বলিল,—'আপনি কেন আমার গাছের ফুল তুল্‌লেন? জানেন, আমার গাছে কেউ হাত দেয় আমি ভালবাসি না?'

সোমেশ কহিল,—'তুল্‌লুম, কারণ গাছের চেয়ে তোমার চুলে এ ফুল ঢের বেশী মানাবে!'

শীলা বলিল,—'আবার ঐ কথা! দিন্ আমার ফুল আমাকে।'

'তাইত দিতে চাইছি। পেছন ফিরে দাঁড়াও।'

'না, হাতে দিন্। ওটাকে আমি দূর করে ফেলে দেব।'

সোমেশ মাথা নাড়িয়া বলিল,—'কখনই হতে পারে না। হয় তোমার চুলে, নয় আমার বুকে। ফেলে দেওয়া অসম্ভব।'

'বেশ, দরকার নেই আমার।' বলিয়া শীলা হাতের খুরপী ফেলিয়া দিয়া বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল। এত বিরক্ত সে আর কখনও হয় নাই। তাহার বোধ হইল, সোমেশ তাহাকে ইচ্ছা করিয়া রাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। একবার তাহার মনে এরূপ সন্দেহও হইল যে, চন্দ্রনাথবাবু বাড়ী নাই জানিয়াই সোমেশ এমন স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছে। ইহাতে তাহার রাগ আরও বাড়িয়া গেল।

'দাঁড়াও একটা কথা আছে।'

শীলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া অন্ধকার মুখ ফিরাইয়া বলিল,—'কি কথা।'

সযত্নে গোলাপ ফুলটি নিজের এণ্ডির কোটের বট্‌ন্‌হোলে আট্‌কাইয়া সোমেশ বলিল,—'তুমি না নাও, আমিই পরলুম। কিন্তু কি সুন্দর ফুলটি দেখ, কেবলি নুয়ে পড়ছে, নরম বোঁটা তার মুখখানি তুলে ধরে রাখতে পারছে না। ঠিক যেন স্নেহভারনত সুকোমল নারী-প্রকৃতি! পুরুষের বুকেই এর যথার্থ স্থান। এই কবিত্বপূর্ণ পুষ্পবাণটি

নিক্ষেপ করিয়া সোমেশ শীলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, সহজভাবে বলিল,—'এগারো মাইল পথ সাইকৃল্ চালিয়ে এবং তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে তৃষিত হয়ে পড়েছি। সুতরাং কেক্ এবং চা দিয়ে অতিথির সম্বর্দ্ধনা যদি করতে চাও তো এই সুযোগ! অয়মহং ভোঃ!'

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুষ্কস্বরে একটা 'আসুন' বলিয়া শীলা বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। সোমেশ তাহার সঙ্গে যাইতে যাইতে বলিল,—'পুরাকালে দুষ্মন্ত বলে এক পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন বোধ হয় শুনেছ। মৃগয়া করতে বেরিয়ে তিনি একদিন এম্নি একটি তপোবনে এসে উপস্থিত হন। শকুন্তলা তখন তরু আলবালে জলসেচন করছিলেন। অপিচ, তাঁর সঙ্গে দু'জন সখী ছিলেন—'

উত্ত্যক্ত হইয়া শীলা কহিল,—'আমি আপনার উপকথা শুনতে চাই না।'

উদারভাবে হাত নাড়িয়া সোমেশ বলিল,—'আচ্ছা বেশ, তাই হোক্! উপকথা শোনবার এটা সময় নয় বটে।' তারপর এদিক-ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'কিন্তু তোমার সেই পোষা মৃগশিশুটিকে দেখছি না।'

অধর দংশন করিয়া শীলা চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

পশ্চিম দিকের ঘন শালবনের অন্তরালে সূর্য্য ঢাকা পড়িল। শালবন হইতে একটি সুমিষ্ট নির্য্যাসগন্ধ উত্থিত হইয়া বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বাংলোর খোলা বারান্দার উপর বেতের চেয়ারে বসিয়া দুই জনে চা-পান সমাপ্ত করিল। শীলা মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সোমেশ রুমালে মুখ মুছিয়া পকেট হইতে সিগার বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতেই শীলা বলিয়া উঠিল;—'ঐ পোড়া গন্ধটা আমি সইতে পারি না।'

সোমেশ তৎক্ষণাৎ মুখের সিগারটা বারান্দার নীচে ফেলিয়া দিল। তারপর পকেট হইতে কুমীরের চামড়ার সিগার-কেসটা লইয়া একে একে সিগারগুলা বাহির করিতে লাগিল। প্রত্যেকটা সিগার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। শেষে যখন সবগুলা নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন কেস-টা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সেটাও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসিল।

শীলা বিস্মিত চোখে তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল, বলিল,—'সব ফেলে দিলেন যে!'

অন্যমনস্কভাবে উর্দ্ধদিকে চোখ তুলিয়া সোমেশ বলিল,—'আর খাব না।—ভাল কথা, তোমার বাবার সঙ্গে আর একটা কথা হয়েছিল সেটা বলতে ভুলে গেছি—'

শীলা উঠিয়া গিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, শীলা উদ্বিগ্নস্বরে কহিল,—'সোমেশবাবু আজ কি আপনি বাড়ী ফিরবেন না? সন্ধ্যা হয়ে গেল যে।'

সোমেশ সেকথা কাণে না তুলিয়া বলিল,—'তোমার বাবার কাছে আমি আজ প্রস্তাব একটা করেছিলুম তার উত্তরে তিনি বললেন—'

অধীর হইয়া শীলা বলিল,—'কিন্তু এদিকে যে রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, এতটা পথ অন্ধকারে যাবেন কি করে? দু'দিকে জঙ্গল, রাস্তাও নিরাপদ নয়।'

সোমেশ উঠিয়া শীলার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—'আজ রাত্রে আমি এইখানেই থাক্‌ব স্থির করেছি। চন্দ্রনাথবাবু নিমন্ত্রণ করেছেন, বাড়ীতে দিদিকেও বলা আছে। সে যাক্। তোমার বাবার কাছে

আমি আজ যে প্রস্তাব করেছিলুম তার উত্তরে তিনি বল্লেন, 'শীলার যদি অমত না থাকে তাঁরও অমত নেই।'

সোমেশের কথার ভঙ্গীতে প্রস্তাবটা যে কি তাহা বুঝিতে শীলার দেরী হইল না। এক ঝলক রক্ত আসিয়া তাহার মুখখানা আরক্ত করিয়া দিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনও বিরূপ হইয়া বসিল। জোর করিয়া যথাসাধ্য সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—'কি প্রস্তাব আপনি করেছিলেন শুনি?'

তাহার একখানা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া সোমেশ বলিল,—'এই পাণি গ্রহণ করবার আবেদন জানিয়েছিলুম।

তাচ্ছিল্যভরে হাসিয়া শীলা হাত ছাড়াইয়া লইল, বলিল,—'ওঃ এই প্রস্তাব। তা বাবা ঠিকই জবাব দিয়েছেন; আমার মত তো তিনি জানেন না।'

অবিচলিতভাবে সোমেশ বলিল,—'আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে তোমার অমত নেই।'

'কি! আপনি বাবাকে বলেছেন—' ক্রোধে, বিরক্তিতে শীলার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে অধর দংশন করিয়া বলিল,,—আপনি অনধিকার চর্চ্চা করেছেন। কোন্ সাহসে আমার সম্বন্ধে এ ধৃষ্টতা প্রকাশ করলেন?'

সোমেশ গম্ভীরভাবে বলিল,—'এই সাহসে যে আমি তোমায় ভালবাসি আর তুমিও আমায় ভালবাস!'

তীব্র অবজ্ঞার স্বরে শীলা বলিয়া উঠিল,—'আপনি ভুল করেছেন। নিজের সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুব উচ্চ হতে পারে, কিন্তু আমি আপনাকে সাধারণ পাঁচজনের সঙ্গে সমান করেই দেখি।'

সোমেশ বলিল,—'মিথ্যে কথা। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস।'

শীলা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। বিদ্রূপভরা স্বরে বলিল,—'আচ্ছা সোমেশবাবু, আপনার কি বিশ্বাস আপনার মত যোগ্য ব্যক্তি পৃথিবীতে আর নেই ?'

সোমেশ বলিল,—'তুমি যদি অমন করে হাস তাহ'লে আমি লোভ সাম্‌লাতে পাবব না।'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া শীলা বলিল,—'তার মানে ?'

'তার মানে—এই।' বলিয়া হঠাৎ শীলার দুই হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া সোমেশ তাহার অধরে চুম্বন করিয়া ছাড়িয়া দিল।

ক্ষণকালেব জন্য শীলা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তারপর বাঁ হাতের পিঠ দিয়া নিজেব ঠোঁট দুটা মুছিতে মুছিতে, ডান হাতে সজোরে সোমেশের গালে এক চড বসাইযা দিয়া পিছু সরিযা দাঁড়াইল। তাহার দুই চোথ দিয়া যেন আগুন ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

চড় খাইয়া সোমেশের গালে চারি আঙ্গুলের দাগ লাল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসি-মুখেই বলিল,—'আমি অহিংসা ব্রতধারী—গান্ধীজীর শিষ্য। বাঁ গালে চড় মার্‌লে ডান গাল ফিরিয়ে দিতে—'

চাপা গর্জ্জনে শীলা বলিযা উঠিল,—'আপনি যান্—যান্ এখান থেকে। ভদ্র মহিলার সঙ্গে কথা কইবার যোগ্য নন্ আপনি। এই দণ্ডে এই বাড়ী থেকে বিদায় হোন।'

এবার সোমেশেব কণ্ঠস্বরে একটু পরিবর্ত্তন হইল। সে যেন ভিতরের আঘাত গোপন করিতে করিতে বলিল,—'কিন্তু বলেছি তো, আজ রাত্রে আমি এখানেই থাক্‌ব, চন্দ্রবাবু নিমন্ত্রণ করেছেন—'

শীলা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল,—'তিনি না জেনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন,

নইলে আপনার মত লোককে কেউ জেনেশুনে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে না।'

সোমেশ চুপ করিয়া অনেকক্ষণ বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে বলিল,—'কিন্তু এদিকেও রাত হয়ে গেছে। পথও বল্‌ছিলে নিরাপদ নয়—'

কণ্ঠস্বরে তীব্র গরল ভরিয়া শীলা বলিল,—'আপনি খাঁটি বাঙ্গালী বটে। অসহায়া স্ত্রীলোককে অপমান কর্‌তে পারেন কিন্তু শেয়ালের ভয়ে পথে বার হতে পারেন না।'

কথাগুলা সাঁওতালী তীরের মত সোমেশের বুকে গিয়া বিঁধিল। অন্ধকারে তাহার মুখ ভাল দেখা গেল না, কিন্তু তাহার গলার পরিবর্ত্তন এবার শীলার কাণেও ধরা পড়িল। তথাপি সোমেশ হাল্কা ভাবেই কথা বলিতে চেষ্টা করিল,—'আমি খাঁটি বাঙ্গালী তা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু শেয়ালের অপবাদটা ভিত্তিহীন, কোনো খাঁটি বাঙ্গালীই শেয়ালকে ভয় করে না। সে যাক্। এখন তাহ'লে বেরিয়ে পড়ি, এগারোটার মধ্যেই বোধ হয় বাড়ী পৌছতে পারব। তোমার বাবাকে বলে দিও আজ থাক্‌তে পার্‌লুম না।' একটু থামিয়া বলিল,—'আর,—যদি ভুল বুঝে অপমান করে থাকি মাপ করো।' বলিয়া সোমেশ ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া শীলা শুনিতে পাইল, ফটক খুলিয়া সোমেশ বাহিরে গেল, বাহির হইতে ফটক বন্ধ করিয়া দিল, তারপর সাইক্‌ল্‌খানা হাতে করিয়া লইয়া একবার ঘন্টি বাজাইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেল। সাইক্‌লের সঙ্গে বাতি ছিল না।

শীলা আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে গিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া আটটা বাজিল।

গালে হাত দিয়া বসিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া শীলা একবার শিহরিয়া উঠিল। এগারো মাইল পথ! সঙ্গে একটা দেশালাই পর্য্যন্ত নাই।

ঘরের ভিতর চাকর আলো দিয়া গিয়াছিল, দাসীটা আসিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিয়া গেল, শীলা কাপড় ছাড়িবে কিনা। কিন্তু শীলা কিছুই শুনিতে পাইল না। দৃষ্টিহীন চক্ষু বাহিরের দিকে মেলিয়া পাষাণ মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

বাহিরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনা গেল এবং পরক্ষণেই হাঁকডাক করিয়া চন্দ্রনাথবাবু বাড়ী ফিরিলেন। সহিস আসিয়া ঘোড়া লইয়া গেল। হ্যাট কোট ইত্যাদি খুলিয়া চাকরের হাতে দিয়া চন্দ্রনাথবাবু বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। চায়ের গরম জল তৈয়ার ছিল, শীলা নীরবে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

মুখহাত ধুইয়া চা পান করিতে করিতে চন্দ্রনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সোমেশ এসেছিল—চলে গেছে?'

শীলা নতনেত্রে বলিল,—'হ্যাঁ।'

চন্দ্রনাথবাবু কন্যার মুখের দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু ও-বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। একথা-সেকথা আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন, -'একটা ম্যান্‌ইটার বেরিয়েছে। মাইল বারো চোদ্দ দূরে সাঁওতালদের গাঁয়ে উৎপাত করছিল, কয়েকটা লোককে নিয়েও গিয়েছিল। এখন সাঁওতালদের তাড়া খেয়ে এদিকে পালিয়ে এসেছে। রাস্তার ধারে ধারে অনেকদূর পর্য্যন্ত তার থাবার দাগও দেখলুম, কিন্তু বাঘটার সন্ধান পাওয়া গেল না। কাল জঙ্গল বীট্‌ করিয়ে তাকে বার করতে হবে।'

ঠিক এই সময়ে বহুদূর দক্ষিণ হইতে ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট শব্দ আসিল—'ফেউ! ফেউ!'

ফেউয়ের ডাক যে পূর্ব্বে শুনে নাই সে কল্পনাও করিতে পারে না যে একটা দুর্দ্দান্ত বাঘের পশ্চাতে একপাল শৃগাল ল্যাজ উঁচু করিয়া যাইতে যাইতে এমন মানুষের মত গলা বাহির করিয়া চীৎকার করে। শীলা এ ডাক বহুবার শুনিয়াছে, তাই তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল! সোমেশ যে ঐ পথেই গিয়াছে! সে ভয়-ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল,—'বাবা, ঐ শোন!'

চন্দ্রনাথবাবু তাহার বিবর্ণ মুখ লক্ষ্য না করিয়া সহজ ভাবে বলিলেন,—'হ্যাঁ, আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম, বাঘটা ঐ দিকেই আছে।' তিনি সহিসকে ডাকিয়া পালিত পশুগুলাকে সাবধানে রাখিতে হুকুম করিয়া দিলেন।

সমস্ত দিন অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া চন্দ্রনাথবাবু ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। শীলাও শুইতে গেল।

ঘরের ঘড়িতে যখন রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল, তখন শীলা নিঃশব্দে নিজের বিছানা হইতে উঠিল। পিতার ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া শুনিল, তিনি গভীর নিদ্রায় নাসিকাধ্বনি করিতেছেন। সাবধানে দরজা খুলিয়া শীলা বাহিরে আসিল। ঊর্দ্ধে তখন এক আকাশ নক্ষত্র দপ্ দপ্ করিতেছে, তাহারই অস্পষ্ট আলোতে সে বাংলো হইতে নামিয়া সহিসের ঘরের দিকে গেল। সহিসের ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল এবং ভিতর হইতে একটা অস্ফুট কাতরোক্তির শব্দ আসিতেছিল। শীলা আস্তে আস্তে কবাটে টোকা মারিয়া ডাকিল,—'ঝিমন!'

ঝিমন জাগিয়াছিল, বাহিরে আসিয়া শীলাকে দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল,—'দিদি, তুমি এত রাত্রে এখানে!"

শীলা চুপিচুপি বলিল,—'ঝিমন, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। এখনি টম্‌টম্ জুতে আমাকে নিয়ে সহরে যেতে হবে।'

ঝিমন ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া শেষে বলিল,—'কি বল্‌ছ দিদি! এই রাত্তিরে—'

শীলা বলিল,—'হ্যাঁ, এই রাত্রে, এখনি। তোমাকে দশটাকা বখশিশ্ দেব। আর দেরী করো না, এখনি যেতে হবে।'

ঝিমন ব্যাকুল হইয়া বলিল,—'কিন্তু কেন, দিদি, কেন? এত রাত্রে সহরে কি এমন দরকার?'

শীলা কম্পিতস্বরে কহিল,—'সে কথায় কাজ নেই, ঝিমন; কিন্তু আজ আমাকে যেতেই হবে। জানি না সহর পর্য্যন্ত যাবার দরকার হবে কিনা।'

ঝিমন চিন্তা করিয়া কহিল,—'ঘোড়া যে ভারী থকে আছে, দিদি, সে কি যেতে পারবে?'

'পারবে। তাকে এক বোতল মদ খাইয়ে দাও।'

ঝিমন তখন বলিল,—'কিন্তু আমি যে কিছুতেই যেতে পারব না দিদি। স্থুয়ার মা'র ব্যথা উঠেছে, আজ রাত্রেই ছেলে হবে। তাকে একলা ফেলে কি করে যাব?' ঝিমন কাতর দৃষ্টিতে শীলার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

পাঁচ মিনিট স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে শীলা বলিল,—'বেশ তোমাকে যেতে হবে না। তুমি কেবল টম্‌টম্ জুতে রাস্তায় এনে দাও—আমি একাই যাব। কিন্তু দেখো, শব্দ করো না। বাবা জেগে উঠ্‌লে আর যাওয়া হবে না।'

ভোর হইতে আর বিলম্ব নাই;—পূর্ব্বদিকে একটা পাংশু শ্বেতাভা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, গাছপালার অস্ফুট মূর্ত্তি পারিপার্শ্বিক

স্বচ্ছতার মধ্যে জমাট অন্ধকারের মত দেখাইতেছে। সোমেশ নিজের বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার নীচে ক্যাম্প খাট পাতিয়া ঘুমাইতেছিল, পায়ের দিকে একপ্রকার অস্বস্তি অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিল। তারপর ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃৎস্পন্দন প্রায় স্তব্ধ হইয়া গেল।

সে দেখিল, মাটির উপর নতজানু হইয়া বসিয়া, তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া মাথা রাখিয়া, পায়ের একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া শীলা ঘুমাইতেছে।

অতি সন্তর্পণে পা ছাড়াইয়া লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ শীলার ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিপুল স্নেহে তাহাকে বুকের কাছে তুলিয়া আনিয়া কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল,—'শীলা! শীলা!'

ঘুমন্ত শীলা চোখ না খুলিয়াই উত্তর দিল,—'উঁ।'

বাড়ীর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল না, ভেজান ছিল মাত্র। সোমেশ শীলাকে লইয়া নিজের ঘরে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল। তারপর দিদির ঘরে গিয়া দিদির গা ঠেলিয়া চুপি চুপি বলিল,—'দিদি, ওঠ। শীলা এসেছে—আমার ঘরে ঘুমুচ্ছে। তুমি তাকে দেখো। আমি চন্দ্রনাথবাবুকে খবর দিতে চল্লুম।' বলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইয়া গেল।

১৪ই ভাদ্র, ১৩৩৮

মরণ দোল

পয়লা মাঘ ১৩৪০ ; সন্ধ্যাকাল। মুঙ্গের সহব বলিয়া যাহা এতকাল পরিচিত ছিল তাহারই একপ্রান্তে আমাদেব ক্লাবের বিধ্বস্ত বিমথিত ঘরখানার বাহিরে আমরা কয়েকজন ক্লাবেব সভ্য বসিয়া ছিলাম। সকলেরই আপাদমস্তক গৈরিক ধূলা ও সুরকিতে আবৃত। কাহাবও পায়ে জুতা নাই। বরদাব গায়ে কেবল একটা গেঞ্জি—বাহুব একটা স্থান কাটিযা ধূলায রক্তে মাথামাখি হইয়া শুকাইযা ছিল। সে থাকিযা থাকিয়া হি হি কবিয়া কাঁপিযা উঠিতেছিল।

বেলা দু'টা বাজিযা বারো মিনিটের সময় ভূমিকম্প হইযা গিয়াছে, কিন্তু আকাশ এখনো বক্তাভ ধূলায় আচ্ছন্ন হইযা আছে। নীচে, উইঢিবির উপর উইয়েব মত অসংখ্য লোক ইটেব স্তূপের উপর ঘুবিযা বেড়াইতেছে, প্রিয়জনের নাম ধবিযা ডাকিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকাব করিয়া কাঁদিতেছে। আমবা ক্লান্ত অবসন্নদেহে বসিযা ধুঁকিতেছিলাম। অভিশপ্ত শ্মশানীভূত সহরের উপব অলাক্ষতে শীতরাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিতেছিল।

সকলেই স্ব স্ব চিন্তায মগ্ন ছিলাম ; তাই মাঝে মাঝে যা দু'একটা কথা হইতেছিল তাহাও ছাড়া ছাড়া অসংলগ্ন বোধ হইতেছিল। শচীন হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—'একটা কোদাল পেলে হযত দাশুটাকে বাঁচাতে পারতুম। ইট আর সুরকির তলা থেকে তাব কাৎরানি শুনতে পাচ্ছিলুম ; কিন্তু শুধু হাত দিয়ে পঞ্চাশ টন ইট্‌-সুরকি সরান—'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শচীন চুপ করিল। শুধু হাতেও যে সে পঞ্চাশ

টন ইট্-সুরকি সরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার রক্তমাখা ক্ষতবিক্ষত আঙুলগুলা তাহার সাক্ষ্য দিতেছিল।

বরদা দন্তবাদ্য কোনোমত থামাইয়া বলিল,—'আজ টেম্পারেচার কত বল্‌তে পার? ফ্রীজিং পয়েন্টের নীচে নেমে গেছে নাকি?'

অমূল্য এতক্ষণ ক্লাবঘরের ভাঙা বরগা, জানালার কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালিতে প্রবৃত্ত ছিল; এখন বলিল,—'এস, ঘিরে বসো। আজ রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা কি?'

সকলে আগুন ঘিরিয়া বসিলাম। বরদা বলিল,—'আমার গোয়াল ঘরটা দাঁড়িয়ে আছে—সেইখানেই সকলে মিলে গুঁতোগুতি করা যাবে।'

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল,—'আর আহার?'

বরদা মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—'ঘাস। আজ আর বিচিলিও পাচ্ছ না।'

অমূল্য হাসিয়া বরদার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল,—'কুচ্‌পরোয়া নেই। গোয়ালেই যখন থাকতে হবে তখন ঘাসে আপত্তি করলে চল্‌বে কেন?'

নন্দ'র একটা পা ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে কোট প্যাণ্টালুন পরিহিত অবস্থায় চিৎ হইয়া ঘাসের উপর শুইয়া সিগারেট টানিতেছিল। মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ জড়ান ছিল; একটা পা প্যাণ্টালুনের উপরেই লাঠি দিয়া সোজা করিয়া বাঁধা ছিল। আমরা তাহাকে চ্যাংদোলা করিয়া আনিয়া আগুনের পাশে শোয়াইয়া দিলাম। নন্দ'র মাথার চোট খুব গুরুতর নয়; কিন্তু সে কেমন যেন ঝিমাইয়া পড়িতেছিল। নিজের মনেই সিগারেট টানিতে টানিতে বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিল,—'দোতালার অফিস রুমে বসে টেব্‌লের ওপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ফুঁকছিলুম; প্রথম আধ মিনিট বুঝতেই পারলুম না যে ভূমিকম্প হচ্চে।

গঁদের শিশিটা টেক্‌লের ওপর থেকে নাচ্‌তে নাচ্‌তে যখন মাটিতে পড়ে গেল তখন বুঝলুম। ঘর থেকে বেরিয়ে পালাতে যাব, সিলিং থেকে একটা এগারো ইঞ্চি খসে মাথায় পড়ল। মুখ থুব্‌ড়ে পড়লুম সেইখানেই—তারপর পায়ের ওপর পড়ল একটা বীম!..... হামাগুড়ি দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলুম—সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছুতে না পৌঁছুতে সমস্ত বাড়ীখানাই মাথার ওপর ভেঙে পড়ল।'

অমূল্য বলিল,—'নন্দ, তুই পেল্লাদ-মার্কা ছেলে। এতেও যখন মরিসনি তখন আর তোর ভাবনা নেই।'

নন্দ নিজ মনে বলিয়া চলিল,—'জ্ঞান যখন হয়, দেখলুম নাকের ফুটো সুরকিতে বন্ধ হয়ে গেছে—হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছি। সর্ব্বাঙ্গের ওপর অসহ্য চাপ, মনে হচ্ছে ইট-পাথরের চাপে পাঁজরাগুলো এখ্‌নি প্যাকাটির মত মট্‌মট্‌ করে ভেঙে যাবে। চোখ খুলে চাইবার উপায় ছিল না, ধুলোয় চোখ বন্ধ। কিন্তু কাণ দু'টো খোলা ছিল। অনেক রকম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলুম আমার বাঁ পাশে আফিসের দপ্তরী কায়দার মিঞা 'পানি লাও' 'সরবৎ লাও' 'হালুয়া লাও' বলে নানারকম ফরমাস করছিল—বোধ হয় তার মাথায় চোট লেগেছিল। ডান দিক থেকে একজনের কাশির আওয়াজ আসছিল, কেউ রক্তবমি করছিল। ক্রমে দু'দিকের শব্দই থেমে গেল। আমার শরীরের ওপর চাপ যেন আরো বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল- কাণ ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। তারপর আর মনে নেই। —তোরা কখন আমায় বার করলি?'

পৃথ্বী দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুখে পুরিয়া চুষিতেছিল—সে ডাক্তার। অঙ্গুষ্ঠ বাহির করিয়া বলিল,—'সাড়ে চারটের সময়। উপুড় হয়ে পড়েছিলি, ভাগ্যে একটা বীম কোণাচে ভাবে তোর ওপর পড়েছিল—নইলে—' আমার দিকে ফিরিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—'হাসপাতালের অবস্থা

কি রকম কিছু জানো? নন্দ'র জন্যে অন্তত একটা splint আর কিছু টিংচার আয়োডিন চাই-ই। মাথায় জখমটা বিশেষ কিছু নয় কিন্তু পায়ে compound fracture of the tibia—যদি গ্যাংগ্রীন set in করে—'

প্রমথ বলিল,—'উপায় নেই। হাসপাতাল দেখে এসেছি—ধুলো হয়ে উড়ে গেছে!'

কিছুক্ষণ সকলে নীরব রহিলাম। আমাদের অঙ্গারগর্ভ ধুনী আরক্তভাবে জ্বলিতে লাগিল। সেইদিকে তাকাইয়া শচীন বলিয়া উঠিল,—'আড়াই মিনিটের মধ্যে সাত শতাব্দীর কীর্ত্তি একটা সহর তাসের বাড়ীর মত ধূলিসাৎ হয়ে গেল। উঃ! কী ভীষণ শক্তি! আমার বিশ্বাস, জার্ম্মাণ হাউইট্জার দিয়ে বারো ঘণ্টা বোম্বার্ড করলেও এমনটা করতে পারত না। কত লোক মরেছে কেউ আন্দাজ করতে পারো?'

অমূল্য বলিল,—'ছ'সাত হাজারের কম নয়।'

প্রমথ মাথা নাড়িল,—'আমি সমস্ত সহর ঘুরে দেখে এসেছি—মোট দশ বারো হাজার লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাকী লোক গেল কোথায়?'

নন্দ জিজ্ঞাসা করিল,—'বাঙালী ক'জন মরেছে?'

তখনো সম্পূর্ণ খবর জানা যায় নাই; যতদূর জানা গিয়াছিল নন্দকে বলিলাম। শুনিয়া নন্দ জিজ্ঞাসা করিল,—'তোদের বাড়ীর সবাই বেঁচে আছে? কেউ যায়নি?'

ভাগ্যক্রমে আমাদের কয়জনের আত্মীয় পরিজন রক্ষা পাইয়াছিল। ঘরবাড়ীর অবশ্য কাহারো চিহ্ন ছিল না; কিন্তু সকলে যে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে এই সৌভাগ্যের আনন্দে সর্ব্বস্ব হারানোর দুঃখও

লঘু হইয়া গিযাছিল। রাজেন সেই কথাই বলিল,—'বাড়ীঘর গিয়েছে যাক গে, বেঁচে থাকলে আবার হবে। কি বলিস? কিন্তু ভেবে ছাখ দেখি, যদি মণি'র মত অবস্থা হ'ত।'

আমরা মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম। মণি'র স্ত্রী পুত্র মা ছোট ভাই—অর্থাৎ পৃথিবীতে আপনার বলিতে যে-কযজন ছিল সকলেই চাপা পড়িযাছিল, কেবল সে একা বাঁচিযা ছিল।

অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না, তার পর চুনী মৃদুকণ্ঠে হাসিতে লাগিল। মণির দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিযা হাসিতেছে না তাহা বুঝিলাম। এতগুলা ভযঙ্কর ঘটনা এত অল্পকালের মধ্যে চক্ষের সম্মুখে ঘটিয়া গিযাছিল যে, মন একটা ঘটনাকে ধরিযা বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারিতেছিল না—আলোর ধাঁধায় দিগ্‌ভ্রান্ত চামচিকার মত এ-দেয়াল হইতে ও-দেযালে আছাড় খাইযা ফিরিতেছিল। আলোচনার ধারাও তাই বিচিত্র রকমের স্বৈরাচারী হইযা উঠিযাছিল।

চুনী বলিল,—'অমূল্য আজ এক কুকুরের প্রাণ রক্ষা করেছে।'

অমূল্য যে কুকুরগতপ্রাণ, একথা আমরা সকলেই জানিতাম, তাই ব্যাপারটা জানিবার জন্য উৎসুক হইযা উঠিলাম। চুনী বলিল,—'সবেমাত্র ভূমিকম্প থেমেছে—আমি ছুটেছি স্কুলের দিকে, ছেলেটার কি হল দেখবার জন্যে। বড়বাজারের চৌমাথার ওপর এসে দেখি, অমূল্য একটা প্রকাণ্ড লোহার বীম নিয়ে টানাটানি করছে। কিন্তু বীম নড়বে কেন? একে ত সেটা নিজেই বিশ মণ ভারী, তার ওপর আবার পঞ্চাশ টন ডেব্রি পড়েছে তার ঘাড়ে। আমাকে দেখে অমূল্য উন্মাদের মত হাত নেড়ে ডাকলে; তার মুখের ভাব দেখে মনে হল হযত বা একটা মানুষ বীমের নীচে চাপা পড়েছে। নিজের ছেলের সন্ধান ছেড়ে ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখি, বীমের এক প্রান্তে একটা কুকুর পিছু ফিরে

বসে আছে আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে! জিজ্ঞাসা করলুম,—'এ কি!' অমূল্য কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে,—'ভাই, ওর ল্যাজ চেপে গেছে, কিছুতে ছাড়াতে পারছি না।'

কি রকম রাগ হয় বল ত? রেগে চলে যাচ্ছিলুম, অমূল্য হাত চেপে ধরলে। কি করি—ভয়ও হল। পরের সন্তানকে বিপদে ফেলে নিজের সন্তান খুঁজতে যাচ্ছি, হয়ত ভগবান দাগা দেবেন। দু'জনে মিলে বীম ধরে ঠেলাঠেলি আরম্ভ করলুম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, বীম একচুলও নড়ল না। অমূল্য কাঁদতে কাঁদতে বললে,—'কি করি ভাই!'

তখন আমার মাথায় এক বুদ্ধি গজালো। জিজ্ঞাসা করলুম,—'ছুরি আছে?' অমূল্য পকেট থেকে ছুরি বার করলে। আমি বললুম,—'আর দেরী নয়, ওর ল্যাজ কেটে ফ্যালো।' অমূল্য বুঝলে ও ছাড়া গতি নেই, দ্বিরুক্তি না করে তার ল্যাজ কেটে ফেল্‌লে।

কুকুরটা ছাড়া পেয়ে মারলে টেনে দৌড়। একবার পিছু ফিরে তাকালে না; অমূল্যকে একটা ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দিল না। এই ত কুকুরের কৃতজ্ঞতা!

অমূল্য গল্পের মধ্যে দু'একবার বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এখন লজ্জিতমুখে বলিল,—'চুণীটা ভারী মিথ্যাবাদী। আমি কেঁদেছিলুম?'

'কাঁদিস নি?'

শচীন বলিল,—'ল্যাজ কাটার কথায় মনে পড়ল। আমি একটি পতিতা নারীকে উদ্ধার করেছি। তবে সম্পূর্ণ নয়।'

'কি রকম?'

'বাজারের ও-অঞ্চলে একটি বাড়ীও খাড়া নেই দেখেছ বোধ হয়। কেবল ইটের পাহাড়। তারই ওপর ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দেখলুম —একটা পা গোছ-পর্য্যন্ত বেরিয়ে আছে। চুটকি পরা স্ত্রীলোকের পা।

হাঁকাহাঁকি করে দু'চার জন লোক জড় করলুম, তারপর সবাই মিলে ইট্ কাঠ সরাতে লাগলুম। মনে হল, পা যখন বেরিয়ে আছে তখন হয়ত মরেনি। অনেক কষ্টে ধড়টা বার করা গেল—ধড়টা বেশ অক্ষত। তারপর গলার কাছে পৌঁছে দেখি—আর কিছু নেই! মুণ্ডুটা সাফ্ ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে।—হাত দশেক দূরে মাথাটা পাওয়া গেল।'

কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শচীন আবার বলিল,—'আজ যে-সব দৃশ্য দেখেছি কখনো ভুলতে পারব বলে বোধ হয় না। গণেশ-লালকে চেনো? বেহারী উকিল? সে কোর্টে ছিল, পাগলের মত ছুট্তে ছুট্তে এসে দেখলে, তার স্ত্রী বাড়ীর সামনে রাস্তার ওপর মরে পড়ে আছে।—গণেশ এখনো স্ত্রীর মৃতদেহ কোলে করে রাস্তার ওপর বসে আছে।'

একটু থামিয়া বলিল,—'কি ভাগ্য দেখ। মেয়েটি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু রাস্তায় নামতেই আর একজনের বাড়ী তার মাথার ওপর ভেঙে পড়ল। নিজের বাড়ী থেকে না বেরুলে হয়ত মরত না।'

বরদা বলিল,—'ওটা তোমার ভুল। মৃত্যু তাকে ডাক দিয়েছিল, যেখানেই থাকুক তাকে যেতে হত।'

চুণী বলিল,—'আমি ত এক সেকেণ্ডের জন্যে বেঁচে গেছি। ডেপুটির কোর্টে একটা কেস্ আরম্ভ করছিলুম, হঠাৎ হাকিমটা এক লাফ মেরে আমার ঘাড়ের ওপর পড়ল। দু'জনে জাপ্টাজাপ্টি করে নাচ্তে নাচ্তে ঘর থেকে যেই বেরিয়েছি অমনি ঘরের ছাদ ধ্বসে পড়ল।'

বরদা বলিল,—'পরমায়ু থাকতে কেউ মরতে পারে না, এই হচ্চে চরম সত্য। নইলে আমি বেঁচে আছি কি করে?'

অমূল্য বলিল,—'খুব খাঁটি কথা। তুমি বেঁচে আছ কি করে সেটা

আমরা সকলেই জান্‌তে চাই। তুমি ত দোতলার ঘরে খিল দিয়ে গৃহিণী সমভিব্যাহারে দিবানিদ্রা দিচ্ছিলে। তুমি বাঁচলে কি করে বল তো শুনি?'

বরদা বলিল,—'সে কথা বললে তোমরা সবাই আমায় অবিশ্বাস করবে। একে তো আমার একটা বদ্‌নাম আছে—'

অমূল্য বলিল—'তোর গল্প যত আষাঢ়েই হোক আজ আমরা শুন্‌ব। আজকের দিনে যদি তুই মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলতে পারিস তাহলে বুঝব তোর মত পাপী নরকেও নেই।'

বরদা বলিল,—'ভাই, আমি কখনো মিথ্যে গল্প বলিনে। হয়ত একটু আধটু রঙ্‌ চড়িয়ে বলি, কিন্তু আজ আর তাও নয়।—নির্জ্জলা সত্যি কথা বলব—সাক্ষী ভগবান।'

তারপর বরদা বলিতে আরম্ভ করিল,—'অমূল্য ঠিক ধরেছে—দিবানিদ্রাই দিচ্ছিলুম, গিন্নীও পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎ গিন্নীর ঠেলা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল, দেখি খাটখানা ঘরময় পিছলে বেড়াচ্ছে। ঘরটা দুলছে, ঠিক যেন কেউ দুহাতে ধ'রে সেটাকে ঝাঁকানি দিচ্ছে। আর, এক হাজার জাঁতা একসঙ্গে ঘোরালে যেরকম শব্দ হয় তেম্‌নি একটা শব্দ মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে।

আমি খুব সাহসী লোক নই; অন্ত মৃত্যুকে ভয় করি না এমন কথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। কিন্তু আশ্চর্য্য—আমার একটুও ভয় হল না; বুদ্ধিও ঘোলাটে হয়ে গেল না। বোধ হয় বিপদটা হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিল বলেই ভয়-বস্তুটা মনের মধ্যে ঢোকবার অবসর পায়নি। বিদ্যুৎ চমকের মত আমার মাথায় খেলে গেল—আজ জীবন মরণের সমস্যা; হয় এস্পার নয় ওস্পার!

আজ তোমাদের কাছে বলতে লজ্জা নেই, বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি

করার সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলাম—মরি তো একসঙ্গে মরব, কেউ কাউকে ছেড়ে দেব না। গিন্নীও আমার বাঁ হাতখানা এমনভাবে চেপে ধরেছিলেন যে ইহজন্মে সে হাত ছাড়ানো সম্ভব ছিল না।

দু'জনে একসঙ্গে খাট থেকে নামলুম। তখন ছাদ থেকে টাইল ভেঙে পড়চে, মেঝে এত দুল্‌ছে যে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন। একটা আল্‌মারি ঠিক পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

দরজা খুলে ঘর থেকে বের হলুম। দোতলায় আর যারা ছিল তারা ভূমিকম্প আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে গিয়েছিল—আমরা যে ঘুমোচ্ছি তা তারা জানত না। সুতরাং দোতলায় কেবল আমরা দু'জনেই রয়ে গিয়েছিলুম।

বুদ্ধিটা পরিষ্কার ছিল, আগেই বলেছি। তাই কি করতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। ঘর থেকে বার হয়ে ঠিক বাঁ-হাতে নীচে নামবার সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে কোনোমতে একবার খোলা যায়গায় পৌঁছুতে পারলেই নিরাপদ।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলুম; এক ধাপ নেমেও ছিলাম—এমন সময় মনে হল কে যেন পিছন থেকে আমাদের টেনে ধরলে।

গিন্নীর চাবি বাঁধা আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছিল, দেখলাম চাবির গোছা দরজার ফাঁকে আটকে গেছে। মুহূর্ত্তের জন্য মনে হল—আজ আর রক্ষা নেই, স্বয়ং যম পিছন থেকে টেনে ধরেছে!

কুকুরের ল্যাজ-কাটার উদাহরণটা তখন জানা ছিল না; তাছাড়া গিন্নী সে অবস্থাতেও বস্ত্র বর্জ্জন করতে সম্মত হলেন না। ফিরে গেলাম। বাড়ীখানা তখন কাঁপ্‌ছে ঠিক ম্যালেরিয়া রুগীর মত, হাড় পাঁজরা তার খসে খসে পড়ছে। ভূমিকম্পের বেগ এত বেড়ে গেছে

যে মনে হচ্চে এখনি সব ওলট পালট হয়ে যাবে—মহাপ্রলয়ের আর দেরী নেই।

চাবিটা দরজা এবং চৌকাঠের ফাঁকে এমন ভাবে আট্‌কে গিয়েছিল যে ছাড়ানো দুষ্কর—তার ওপর গিন্নী একটি হাত চেপে ধরে আছেন। মাথার ওপর এক চাপ্‌ড়া প্ল্যাষ্টার খসে পড়ল, তবু আঁচল ধরে টানাটানি করতে লাগলুম। তারপরেই দোরের খিলেন ভেঙে হাতের ওপর পড়ল। হাতটা ভাগ্যক্রমে ভাঙ্‌ল না কেবল থেঁৎলে গেল। তখন আঁচল ধরে প্রাণপণে মারলুম এক টান! আঁচলের খুঁট ছিঁড়ে গেল। চাবিটা দরজার ফাঁকেই আট্‌কে রইল।

আবার ছুটে গেলুম সিঁড়ি দিয়ে নামবার জন্য। কিন্তু নামা হল না। ঠিক সিঁড়িতে পা দিয়েছি এমন সময় সেই হাজার জাঁতা ঘুরোণোর শব্দের ভেতর থেকে কে যেন প্রচণ্ড স্বরে বলে উঠ্‌ল,—'ওদিকে যাস্‌নি।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বরদা থামিল, হাত দু'টা আগুনের দিকে প্রসারিত করিয়া দিল। দেখিলাম, তাহার রোমশ বাহুর উপর চুলগুলা কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে।

বরদা আবার আরম্ভ করিল,—'মতিভ্রম বলতে হয় বল, কিন্তু সে আওয়াজ এখনো আমার কাণে বাজ্‌ছে। মেঘের মত আওয়াজ—ওদিকে যাস্‌নি! কে একথা বললে জানি না, তখন অনুসন্ধান করবারও সময় ছিল না—তবে এ হুকুম অমান্য করা যে উচিত হবে না, তা বুঝতে পারলুম।

কিন্তু যাব কোন্‌দিকে? এখানে থাকলে ত মৃত্যু নিশ্চিত। চারিদিকে দেওয়ালগুলো চোখের সামনে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। ছাদ্‌টা ধ্বসে পড়ল বলে। সিঁড়ির ছাদ মুহুর্মুহু হাঁ হয়ে আবার জোড়া লেগে যাচ্ছে।

আমাদের দোতালার ঘরগুলোর মাঝখানে একটা ছোট চৌকশ খোলা ছাদ আছে—সেইদিকে গিন্নীকে টেনে নিয়ে চললুম। গিন্নীর হাঁটু তখন জবাব দিয়েছে, তাঁকে একরকম বগলে করে নিয়েই ছুটলুম। ভাবলুম, যদি বাঁচতে হয় তবে ঐ খোলা ছাদটাই একমাত্র ভরসা।

খোলা যায়গায় এসে পৌঁছুতেই একটা বিরাট হাসির শব্দ কাণে ঢুক্‌ল—এটা এতক্ষণ শুনিনি। ঠিক যেন একটা পাগলা দৈত্য হা হা করে হাসছে আর সগৌরবময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। চেয়ে দেখলুম, আকাশ সুরকির লাল ধূলোয় ছেয়ে গেছে, আর তারই ভেতর দিয়ে বড় বড় বাড়ীগুলো ঘাড় মুচ্‌ড়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

বলতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু মাত্র আড়াই মিনিটের ত ব্যাপার। তখন বোধ হয় দেড় মিনিট কেটেছে। আমি ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। গিন্নী আমার হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে বসে পড়েছেন। চারি ধারে এই প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার চলছে। এই সময় ভূমিকম্পের বেগ বেশ একটু কমে এল—মনে হল বুঝি থেমে আসছে। কিন্তু সে সেকেণ্ড দশেকের জন্যে। তারপর যা আরম্ভ হল তার বর্ণনা বোধ হয় হোমর কিম্বা বাল্মীকিও দিতে পারতেন না।

তুফানের মাঝখানে ডিঙ্গীর মত পৃথিবী দুলতে লাগল। এতক্ষণ চারিদিকের দৃশ্য ঘোলাটে ভাবে দেখতে পাচ্ছিলুম, এখন একটা গাঢ় লাল ধোঁয়ায় সমস্ত ঢাকা পড়ে গেল। কেবল চতুর্দ্দিক থেকে সেই পৈশাচিক হাসি আর বাড়ী ঘর ভেঙে পড়ার হুড়মুড় শব্দ শুনতে লাগলুম।

আমাদের বাড়ীখানা আমার চারিপাশে ভেঙে ভেঙে পড়ছে বুঝতে পারলুম কিন্তু চোখে দেখ্‌তে পেলুম না। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম, এইবার ছাদ ফাঁক হয়ে আমাদের গ্রাস করে নেবে, নয়ত, পাশের একটা দেয়াল মাথার ওপর ভেঙে পড়বে।

মৃত্যুকে আজ তোমরা সকলেই মুখোমুখি দেখেছ, কিন্তু আমার মতন সজ্ঞানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে তার জন্যে প্রতীক্ষা বোধ হয় কেউ করেনি। মৃত্যু দেবতার করাল মুখের পানে আমি একদৃষ্টে চেয়ে দেখেছি কিন্তু তবু আমার চোখের পলক পড়েনি—আজ সর্ব্বস্ব হারানোর দিনে এইটুকুই আমার লাভ।

যাহোক, পৃথিবীতে সব জিনিষেরই যখন একটা শেষ আছে, তখন প্রাকৃতিক নিয়মে ভূমিকম্পও শেষ হতে বাধ্য। আড়াই মিনিটের প্রলয় মাতনের মত ভূমিকম্প থামল।

ধূলোর অন্ধকার যখন একটু পরিষ্কার হল তখন দেখলুম বাড়ীর চিহ্নমাত্র নেই—শুধু একটা থামের মাথায় একহাত চৌকশ যায়গার ওপর আমি আর আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছি—যেন স্তম্ভের মাথায় পাথরের দুটি পুতুল! ব্যাপারটা বুঝেছ? সমস্ত বাড়ীর মধ্যে কেবল ঐ থামটি দাঁড়িয়ে আছে, আর সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। আমরা যদি নীচে নামতুম তাহলে আর বেরুতে পারতুম না, জাঁতা-কলে ইঁদুরের মত চাপা পড়ে থাকতুম।

বরদা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তারপর কতকটা নিজ মনে বলিল,—'কিন্তু কে সে—যে গর্জ্জন করে আমাদের সাবধান করে দিলে? আমি শুধু তাই ভাবছি। আমাদের পরমায়ু ছিল তাই বেঁচে গেলুম একথা সত্যি। কিন্তু 'ওদিকে যাস্‌নি' বলে মানুষের গলায় হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল কে?'*

২রা ফাল্গুন, ১৩৪০

* এই গল্পের অধিকাংশ ঘটনাই সত্য ও লেখকের প্রত্যক্ষীকৃত।

ভল্লু সর্দ্দার

গোড়াতেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে ভল্লুর বয়ঃক্রম ছয় বৎসর। তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু সন্দেহ করিলে চলিবে না। আমরা তাহার ঠিকুজি কোষ্ঠীর সহিত পরিচিত।

ভল্লুর জীবনযাত্রা বোধ করি আরো কয়েক বৎসর অল্পস্বল্প দুষ্টামি করিয়া অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যহীনভাবেই কাটিয়া যাইত, কিন্তু হঠাৎ একদিন বায়স্কোপ দেখিতে গিয়া সব ওলটপালট হইয়া গেল। সে অপূর্ব্ব কয়েকটি আইডিয়া লইয়া বায়স্কোপ হইতে ফিরিয়া আসিল।

প্রধান আইডিয়া, সে নিজে একজন দুর্দ্দান্ত ডাকাতের সর্দ্দার। যেমন তেমন সর্দ্দার নয়,—একদিকে যেমন দুর্দ্ধর্ষ বীর, অন্যদিকে তেমনি ন্যায়-পরায়ণ—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই তাহার ধর্ম্ম। যদিচ, তাহার একযোড়া ভয়ঙ্কর গোঁফ নাই, এই এক অসুবিধা। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, গোঁফ ডাকাতের সর্দ্দারের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। কারণ, দরোয়ান ছেদী সিংএর গোঁফ ত আছেই উপরন্তু গালপাট্টা আছে কিন্তু তবু তাহাকে কোনও দিন দুষ্টের দমন কিম্বা শিষ্টের পালন করিতে দেখা যায় নাই। আসল কথা, আচরণ ডাকাত সর্দ্দারের মত হওয়া চাই, গোঁফ না থাকিলেও আসে যায় না।

কিন্তু সর্দ্দার হইতে হইলে ডাকাতের দল চাই। বায়স্কোপে সর্দ্দারের প্রকাণ্ড দল ছিল, তাহারা হুকুম পাইবামাত্র নানাবিধ অসমসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিত, অত্যাচারী জমিদারের বাড়ী লুঠ করিয়া তাহাকে

গাছের ডালে লটকাইয়া দিত। ভল্লুর সে রকম দল কোথায়? অনুগত অনুচরের মধ্যে তিন বছরের অনুজা লিলি, আর একটি নিংলে কুকরছানা —গামা। অদূর ভবিষ্যতে এই কুকুর শাবকটি মহা শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এই আশায় তাহার উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

ইহারা দুজনেই ভল্লুর একান্ত অনুগত বটে কিন্তু আদেশ পাইবামাত্র কোনও অসমসাহসিক কাজ করিবে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একবার একটা হুলো বিড়ালকে আক্রমণ করিবার জন্য ভল্লু গামাকে বহু প্রকারে উত্তেজিত করিয়াছিল কিন্তু গামা সম্মত হয় নাই, বরঞ্চ অত্যন্ত কাতরভাবে পুচ্ছ সঙ্কুচিত করিয়া বিপরীতমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। আর লিলি—সে একে মেয়েমানুষ, তায় দৌড়িতে পারে না; দৌড়িতে গেলেই পড়িয়া যায়। তাহাকে দিয়া কোনও কাজ হইবে না।

কিন্তু এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ভল্লু ভগ্নোৎসাহ হইল না। অনুচর না থাকে, না থাক—সে নিঃসঙ্গভাবেই সর্দ্দার বনিবে। যদি তার ডাক শুনিয়া কেহ না আসে সে একলা চলিবে। বায়স্কোপেও ত ডাকাত সর্দ্দার একাকী দুর্গ-প্রাকার লঙ্ঘন করিয়া বন্দিনী তরুণীকে উদ্ধার করিয়াছিল।

সে যা হোক, কিন্তু সর্দ্দার বনিয়া সে কোন্ কোন্ দুষ্টের দমন করিবে? কারণ, শিষ্টের পালন পরে করিলেও ক্ষতি নাই কিন্তু দুষ্টের দমন প্রথমেই করা দরকার। সর্ব্বাগ্রে তাহার মাষ্টার মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। দুষ্ট লোক বলিতে যাহা-কিছু বুঝায়, সব দোষই মাষ্টার-মহাশয়ে বিদ্যমান। ভোর হইতে না হইতে তিনি আসিয়া হাজির হন। পাঠ্য পুস্তকের প্রতি ভল্লুর অনুরাগ কিছু কম বিশেষতঃ অঙ্কশাস্ত্রে সে একেবারেই কাঁচা। তাই, পরবর্ত্তী দু'ঘণ্টা ধরিয়া যে

দারুণ অত্যাচার ,উৎপীড়ন চলিতে থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। এত বড় অত্যাচারীকে শাসন করা ডাকাত সর্দ্দারের প্রথম কর্ত্তব্য।

কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া ভল্লু মাষ্টার-মহাশয়কে পরিত্যাগ করিল। তাঁহার চেহারাখানা এতই নিরেট, দেহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থও এত বিপুল যে টিনের তরবারি দিয়া তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া লওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাঁহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়াও ভল্লুর সাধ্যাতীত। দুঃখিতভাবে ভল্লু তাঁহাকে অব্যাহতি দিল।

আর শাস্তিযোগ্য কে আছে? ছেদী সিং দরোয়ান! ভল্লু মনে মনে মাথা নাড়িল। ছেদী সিংএর চেহারাটা দুষমণের মত বটে; কিন্তু কেবলমাত্র চেহারা দেখিয়া তাহার বিচার করিলে অন্যায় হইবে। সে প্রায়ই পেয়ারা, কুল, কামরাঙা আহরণ করিয়া আনিয়া চুপি চুপি ভল্লুকে খাওয়ায়; মাঝে মাঝে কাঁধে চড়াইয়া বেড়াইতে লইয়া যায়। অধিকন্তু সন্ধ্যার সময় কোলের কাছে বসাইয়া অতি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনীকেচ্ছা বলে—শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। না—ছেদী সিং দরোয়ানকে পাপিষ্ঠ দুষ্কৃতকারীর পর্য্যায়ে ফেলা যায় না।

তবে—আর কে আছে? বাবা? ভল্লু অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়া চিন্তা করিল। অভাবপক্ষে বাবাকে পাপিষ্ঠ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাবা লোকটি নেহাৎ মন্দ নয়। মার-ধর তিনি একেবারেই করেন না, নিজের লেখাপড়া লইয়াই সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন, (যদিও, অত লেখাপড়া করা পাপিষ্ঠের লক্ষণ কিনা তাহাও বিবেচনার বিষয়)। উপরন্তু, ভল্লুর মাতার সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব আছে বলিয়া মনে হয়। প্রায়ই তাঁহাদের মধ্যে হাস্য-পরিহাস ও অন্তরঙ্গের মত কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে—ভল্লু তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। আবার

মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে ঝগড়াও হয়,—তখন ভল্লুর মা চোখে আঁচল দিয়া অস্পষ্ট ভগ্নস্বরে কি বলিতে থাকেন অধিকাংশ বোঝাই যায় না এবং বাবা মুখ ভারী করিয়া ধীরে ধীরে এমন দু'একটি বাক্যবাণ প্রয়োগ করেন যে, মায়ের কান্না আরও বাড়িয়া যায়। অতঃপর, ঝগড়া থামিয়া গেলে বাবা নিভৃতে মাকে অনেক আদর ও খোসামদ করিতেছেন ইহাও ভল্লুর চক্ষু এড়ায় নাই।

এরূপ ক্ষেত্রে কি করা যায়? ভল্লু বড় দ্বিধায় পড়িল। বাবাকে অন্তরের সহিত বদ্-লোক বলা চলে না; অথচ তাঁহাকে বাদ দিলে আর শাস্তি দিবার লোক কোথায়? তবে কি কেবলমাত্র দুষ্ট-লোকের অভাবেই একজন মহাপ্রাণ ডাকাত সর্দ্দারের জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে? মুণ্ড কাটিয়া ফেলিবার মত লোকই যদি পৃথিবীতে না থাকে, তবে ডাকাত হইয়া লাভ কি?

শীতের দ্বিপ্রহরে চিলের কোঠায় একাকী বসিয়া ভল্লু এইরূপ গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। এখন সে ধীরে ধীরে উঠিল। এই নৈষ্কর্ম্মের অবস্থা তাহার ভাল লাগিল না। একটা কিছু করিতে হবে। যদি একান্তই পাষণ্ড লোক না পাওয়া যায়—

ভল্লু দ্বিতলে অবতরণ করিল। কেহ কোথাও নাই—বাড়ী নিস্তব্ধ। মা বোধ হয় লিলিকে ঘুম পাড়াইয়া নিজেও একটু শুইয়াছেন। ভল্লু মা'র ঘর অতিক্রম করিয়া চুপি চুপি কাকিমার ঘরে উঁকি মারিল। দেখিল, কাকিমা পালঙ্কের উপর বুকের তলায় বালিশ দিয়া শুইয়া করতলে চিবুক রাখিয়া উদাস-চক্ষে জানালার বাহিরে তাকাইয়া আছেন।

এই ঘরটি কাকিমার শয়নকক্ষ বটে, কিন্তু ব্যাপার গতিকে ভল্লুরও শয়নকক্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে ভল্লু নিজের মা'র কাছে শয়ন

করিত ; এই ঘরটা ছিল কাকার। মাস দেড়েক পূর্ব্বে কাকার বিবাহ হইল ; তারপর কি একটা গণ্ডগোল হইয়া গেল,—ফলে কাকা নিজের ঘর ছাড়িয়া বাহিরের একটা ঘরে আশ্রয় লইলেন এবং নবপরিণীতা কাকিমা তাঁহার ঘর দখল করিলেন। ভল্লু বোধ করি কাকিমার রক্ষক হিসাবেই তাঁহার শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল।

সুতরাং কাকিমার শয়নকক্ষটিকে ভল্লুর শয়নকক্ষ বলা যাইতে পারে। এই ঘরেই তাহার যাবতীয় খেলার উপকরণ ও অস্ত্র-শস্ত্র লুক্কায়িত ছিল। ডাকাত-সর্দ্দারের প্রধান আয়ুধ—একটি টিনের তরবারি—তাহাও এই ঘরে পালঙ্কের নীচে থাকিত। তরবারিটা বাড়ীসুদ্ধ লোকের চক্ষুশূল ; সকলেরই আশঙ্কা ভল্লু ঐ তরবারি দিয়া কখন কাহার চোখে খোঁচা দিবে। তাই, ভল্লু সেটাকে অতি সঙ্গোপনে পালঙ্কের নীচে কম্বল চাপা দিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

ভল্লু কিছুক্ষণ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নিঃশব্দে পা টিপিয়া প্রবেশ করিল। কাকিমার মাথার কাপড় খোলা, তাঁহার খোঁপায় সোনার শিকলে বাঁধা কাঁটাগুলি ভল্লু দেখিতে পাইল। কিন্তু কাকিমার উদাস দৃষ্টি জানালার বাহিরে প্রসারিত ; কি জানি কি ভাবিতেছেন। তিনি ভল্লুর আগমন জানিতে পারিলেন না।

সাবধানে ভল্লু পালঙ্কের তলায় প্রবেশ করিল ; কিন্তু তরবারি কম্বলের ভিতর হইতে বাহির করিতে গিয়া ঠুং করিয়া একটু শব্দ হইয়া গেল। কাকিমা চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'কে রে ! ভল্লু বুঝি ? খাটের তলায় কি করছিস্ ?'

ধরা পড়িয়া গিয়া ভল্লু বলিল,—'কিচ্ছু না'—তারপর তরবারি হস্তে খাটের তলা হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ডাকাত-সর্দ্দারকে কাকিমার সম্মুখে হামাগুড়ি দিতে হইল বলিয়া

ভল্লু মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু বাহিরে গর্ব্বিত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

তারপরই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল দেখিল, কাকিমার সুন্দর চোখ দুটিতে জল টল্ টল্ করিতেছে!

কাকিমা চট্ করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—'কি করছিলি!'

'কিচ্ছু না'—কাকিমার মুখের উপর সুবর্তুল চোখের দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল,—'তুমি কাঁদছ কেন?'

কাকিমা লজ্জিতভাবে মুখখানাকে আর একবার আঁচল দিয়া মুছিয়া বলিলেন,—'কৈ কাঁদছি?—তুই সারা দুপুর রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ ত? আয়, আমার কাছে এসে শো।'

'না'—ভল্লুর কৌতূহল তখনও দূর হয় নাই, সে পুনরায় প্রশ্ন করিল,—'কাঁদছিলে কেন বল না। ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?'

স্ত্রীজাতি ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই কাঁদে ইহা সে লিলির উদাহরণ দেখিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছিল।

'দূর!

'তবে?'

'কিচ্ছু না।—তুই তলোয়ার নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস? আয় আমার কাছে।'

'না—আমি এখন যাচ্ছি একটা কাজ করতে।'—বলিয়া ভল্লু দ্বারের দিকে পা বাড়াইল।

কাকিমা তাহাকে ডাকিলেন,—'ভল্লু শুনে যা একটা কথা।'

ভল্লু অনিশ্চিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল—'কি?'

'কাছে আয়।'

ভল্লু সন্দিগ্ধভাবে কাকিমাকে নিরীক্ষণ করিল। তাহাকে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবার অভিসন্ধি তাঁহার নাই তো?—নাঃ, কাকিমা ভাল লোক, তিনি এমন নির্দ্দয় ব্যবহার কখনই করিবেন না।

ভল্লু কাছে আসিয়া অধীরভাবে বলিল,—'কি?'

কাকিমার মুখ একটু লাল হইল; তিনি ভল্লুর হাত ধরিয়া তাহাকে খুব কাছে টানিয়া আনিলেন, তারপর প্রায় তাহার কাণে কাণে বলিলেন,—'তোর কাকা কোথায় রে?'

ভল্লু তাচ্ছিল্যভরে বলিল,—'জানি না। বোধ হয় নীচে আছেন।'

কাকিমা আরও নিম্নস্বরে বলিলেন,—'দেখে এসে আমায় বলতে পারবি? কাউকে কিছু বলিস্‌নি, শুধু দেখে আসবি।'

'আচ্ছা' বলিয়া ভল্লু প্রস্থান করিল। এই সামান্য বিষয়ে এত গোপনীয় কি আছে সে বুঝিতে পারিল না।

নীচে নামিয়া ভল্লু বাহিরের দিকে চলিল। বাহিরের একটা ঘরে তক্তপোষের উপর ফরাস পাতা; তাহার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া কাকা বৈরাগ্যপূর্ণ চক্ষে কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া আছেন। ভল্লু দু'একবার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিল কিন্তু কাকার ধ্যানভঙ্গ হইল না; তখন ভল্লু কাকিমাকে খবরটা দিয়া আসিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার কুকুর গামা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া লাফাইতে লাগিল এবং তরুণ অপরিণত কণ্ঠে ঘেউ ঘেউ করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

গামার বয়ঃক্রম তিনমাস, চেহারা অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বল। সে যে কালক্রমে ভয়ঙ্কর তেজস্বী বিলাতী কুকুর হইয়া দাঁড়াইবে এ বিষয়ে কেবল ভল্লুর মনেই কোনও সংশয় ছিল না। গামার গলার একটি বক্‌লস্ কিনিয়া দিবার জন্য সে বাড়ীর সকলের কাছে

জনে জনে মিনতি করিয়াছিল কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই।

চেঁচামেচিতে কাকা বিরক্তিপূর্ণ চোখ কড়িকাঠ হইতে নামাইয়া ভল্লুর দিকে চাহিলেন। ভল্লু তাড়াতাড়ি গামাকে লইয়া সরিয়া গেল।

গামা দীর্ঘকাল পরে প্রভুর সাক্ষাৎ পাইয়াছে—তাহার ক্ষীণ শরীরে যেন আর আনন্দ ধরে না। সে একবার বাগানের দিকে ছুটিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসিয়া ভল্লুর পায়ের উপর থাবা রাখিয়া সাগ্রহে তাহার মুখের পানে তাকায়, তাহার মনের ভাবটা—চল না বাগানে যাই। এমন দুপুর বেলা ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতে তোমার ভাল লাগছে? চল চল, বাগানে কেমন ছুটোছুটি করব!

ভল্লু একটু ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গামার আমন্ত্রণ অবহেলা করিতে পারিল না। কাকিমাকে কাকার সংবাদ পরে দিলেও চলিবে—এত তাড়াতাড়িই বা কি! বিশেষতঃ কাকা তো কিছুই করিতেছেন না, কেবল চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন। এ সংবাদ দু'ঘণ্টা পরে দিলেও কোনও ক্ষতি হইবে না। ভল্লু গামাকে লইয়া বাগানে চলিল।

বাড়ীর সংলগ্ন বাগানটা বেশ বিস্তৃত। মাঝে মাঝে আম, লিচু, গোলাপ-জামের গাছ—বাকিটা ফুলের গাছে ভরা। বর্ত্তমানে বিলাতি মরশুমি ফুলের শোভায় বাগান আলো হইয়া আছে। কোথাও একরাশ পপী উগ্র রূপের ছটায় মৌমাছিদের আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। ওদিকে সুইট্-পী'র ঝাড় পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া সহস্র ফুলের প্রজাপতি ফুটাইয়া রাখিয়াছে। স্থানে স্থানে দু'একটা চন্দ্রমল্লিকা কোঁকড়া মাথা দুলাইয়া নিষ্কলঙ্ক শুভ্র হাসি হাসিতেছে।

কিন্তু উদ্যান-শোভার দিকে ভল্লুর দৃষ্টি নাই। তাহার হাতে

তরবারি, পশ্চাতে ভক্ত অনুচর। সে খুঁজিতেছে অ্যাড্‌ভেঞ্চার। কিন্তু হায়, এই ফুলের মরুভূমিতে অ্যাড্‌ভেঞ্চার কোথায়? বিমর্ষভাবে ভল্লু কয়েকটা ডালিয়া ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিল।

কিন্তু ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলে জগতে কোনো জিনিষই দুষ্প্রাপ্য হয় না, শত্রুও অচিরাৎ আসিয়া দেখা দেয়। অবশ্য কল্পনার জোর থাকা চাই। ভল্লু শত্রুর অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একটি চন্দ্রমল্লিকা গাছের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাঢ় লাল রঙের চন্দ্রমল্লিকা—একটি কঞ্চির ঠেক্‌নোতে ভর দিয়া সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভল্লু কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইল—এ চন্দ্রমল্লিকা নয়, মহাপাপিষ্ঠ জমিদার। ইহার অত্যাচারে বাগানের অন্য সমস্ত ফুল ভয়ে জড়সড় হইয়া আছে; উহার রক্ত চক্ষুর সম্মুখে অদূরে ঐ ভূ-লুণ্ঠিতা পরটুলাকার ফুলটি বন্দিনী তরুণীর মত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে।

উত্তেজনায় ভল্লুর চোখ জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সে পায়তারা কষিয়া একবার শত্রুর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিল, তারপর তরবারি আস্ফালন করিয়া কঠোর স্বরে কহিল,—'ওড়ে নড়াধম'—

উত্তেজিত হইলে ভল্লুর উচ্চারণ কিছু বিকৃত হইয়া পড়িত।

নরাধম কোনো জবাব দিল না, কেবল আরক্ত চক্ষে চাহিয়া রহিল। গামা উৎসাহিতভাবে বলিল—'ভুক্ ভুক্—'

ভল্লু পদদাপ করিয়া বলিল,—'ওড়ে নড়াধম, তুই জানিস্ আমি কে? আমি ভল্লু সর্দ্দার—তোর যম।'

এত বড় দুঃসংবাদেও নরাধম বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। ভল্লু তখন গর্জ্জন করিয়া বলিল,—'পাজি-উল্লুক-গাধা, এই তোর মুণ্ডু কেটে ফেললুম!' বলিয়া সবেগে তরবারি চালাইল।

দুর্ব্বিনীত নরাধমের মুণ্ড কাটিযা মাটিতে পড়িল।

'ভল্লু!'—

হঠাৎ পিছন হইতে গুরু-গম্ভীর আহ্বান শুনিযা ভল্লুর ক্ষাত্র-তেজের উত্তাপ এক মুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইল; সে সভয়ে ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিল—কাকা! কাকার বৈরাগ্যপূর্ণ ললাটে বৈশাখী মেঘের মত ভ্রূকুটি। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন।

গামা কাকার আগমনের সাড়া পাইয়া কাপুরুষের মত আগেই সরিযাছে। উপায় থাকিলে ভল্লুও সরিত কিন্তু কাকা এত কাছে আসিয়া পড়িযাছেন যে পলায়নের চেষ্টা বৃথা। কাল-বৈশাখীর ঝড়টা তাহার মাথার উপর দিয়াই যাইবে।

কাকা আসিযা উপস্থিত হইলেন, ভল্লুর শ্রবণেন্দ্রিয় ধারণ করিয়া বলিলেন,—'এ কি করেছিস্?'

ভল্লু বাঙ্-নিষ্পত্তি করিল না। বাগানের ফুল ছেঁড়া বারণ একথা সে বরাবরই জানে এবং সাধ্যমত এ নিষেধ মান্য করিয়া আসিয়াছে। তবে যে আজ কোন্ দুরন্ত কর্ত্তব্যের তাড়নায় ঐ ফুলটাকে বৃন্তচ্যুত করিযাছে তাহা কাকাকে কি করিয়া বুঝাইবে? ফুলটা যে ফুল নয়—একটা মহাপাপিষ্ঠ নরাধম, এ কথা কাকা বুঝিবেন কি? সকলের কল্পনাশক্তি সমান নয়, ভল্লু জানিত কাকা বুঝিবেন না। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং—তার চেয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। ভল্লু নীরব রহিল।

কাকা ভল্লুর হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—'কেন ফুল ছিঁড়্লি?'

ভল্লু এবারও জবাব দিল না। কাকা তখন তাহার কাণ ছাড়িয়া চুলের মুঠি ধরিলেন, সজোরে নাড়া দিয়া বলিলেন,—'পাজি-উল্লুক গাধা,

কতবার তোকে মানা করেছি বাগানের ফুলে হাত দিস্‌নি। কেন ছিঁড়্‌লি বল্‌!'

বারবার একই প্রশ্নে ভল্লু উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল। তার উপর চুলের যন্ত্রণা! কাকার বজ্রমুষ্টি ক্রমে ক্রমে যেরূপ দৃঢ়তর হইতেছে, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত চুলগুলি তাঁহার মুঠিতেই থাকিয়া যাইবে। অথচ ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হইতেছে একটা কোনও উত্তর না পাইলে কাকা শান্ত হইবেন না। যন্ত্রণা ও উগ্র প্রয়োজনের তাড়ায় ভল্লুর মাথায় এক বুদ্ধি গজাইল। সে সজল চক্ষে চিঁ চিঁ করিয়া বলিল,—'কাকিমার জন্যে ফুল তুলেছি!'

ইন্দ্রজালের মত কাজ হইল। সচকিতভাবে কাকা চুল ছাড়িয়া দিলেন, হতবুদ্ধির মত বলিলেন,—'কি বললি?'

এতটা ভল্লুও প্রত্যাশা করে নাই, কিন্তু যে পথে সুফল পাওয়া গিয়াছে সেই পথেই চলাই ভাল। সে আবার বলিল,—'কাকিমার জন্যে ফুল তুলেছি'—বলিয়া ভূপতিত ফুলটা সযত্নে তুলিয়া লইল, তারপর আবার আরম্ভ করিল,—'কাকিমা বললেন—'

'কি বল্‌লেন?'

খুল্লতাতের জেরায় পড়িবার ইচ্ছা ভল্লুর আদৌ ছিল না, বিশেষতঃ মোকাবিলায় মিথ্যা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা যখন সম্পূর্ণ বিদ্যমান। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের একটা মহৎ দোষ, তাহারা প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না পাইলে চটিয়া যায়, কল্পনা বলিয়া যে ঐশী শক্তি মাথার মধ্যে নিহিত আছে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে চায় না। ভল্লু কাকার প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া বলিল,—'কাকিমা বড্ড ফুল ভালবাসে, রোজ খোঁপায় তিন্‌টে পাঁচটা ফুল পরেন—'

খুল্লতাত অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর বিলম্ব করা অনুচিত বুঝিয়া ভল্লু প্রস্থানোদ্যত হইল।

কাকা ডাকিলেন,—'ভল্লু—শোন্—'

ভল্লু খানিক দূর গিয়াছিল, সেখান হইতে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল,—'আর, কাকিমা তোমায় ডাকছিলেন—তুমি কোথায় আছ দেখতে বললেন'—বলিয়া ক্ষুদ্র পদযুগল সবেগে চালিত করিয়া দিল।

* * * *

বাগানের নৈঋ্ঝ‍র্ত কোণে একটি বড় আম গাছের নিম্নতম শাখায় ভল্লুর স্থায়ী আড্ডা ছিল। স্থূল শাখাটি ভূমির সমান্তরালে কাণ্ড হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল; তাহার ডগার দিকে বসিয়া দোল দিলে শাখাটি মন্দ মন্দ দুলিত।

এই শাখার ঘনপল্লবিত ডগায় বসিয়া একটা বড় রকম দোল দিয়া বিক্ষুব্ধচিত্ত ভল্লু ভাবিতে আরম্ভ করিল। গামা এতক্ষণ নিরুদ্দেশ ছিল; এখন, যেন কিছুই হয় নাই এম্‌নি ভাবে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে গাছের তলায় আসিয়া বসিল। ভল্লু একবার ভর্ৎসনাপূর্ণ চক্ষে তাহার পানে তাকাইল। অনুচরের ভীরুতা তাহার মর্ম্মে দারুণ আঘাত করিযাছিল।

তারপর পুনরায় সে ভাবিতে আরম্ভ করিল।

প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। দুষ্টের দমনব্রত গ্রহণ করিয়া ভল্লু চারিদিকে দুষ্ট অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে,—অথচ দুষ্ট, অত্যাচারী, দুর্ব্বৃত্ত বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ ভল্লুর সম্মুখেই হাজির রহিয়াছে। এতক্ষণ এটা সে দেখিতে পায় নাই কেন? তাহার মত মহাপাপিষ্ঠ নরাধম পৃথিবী খুঁজিয়া আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

শুধু আজিকার এই ঘটনার জন্য নয়, কাকা যে একজন অবিমিশ্র

পাবও ইহা তাঁহার অনেকদিন আগেই জানা উচিত ছিল। প্রথমতঃ তিনি ডাক্তার—ডাক্তারেরা যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বদ-লোক এ কথা শিশু সমাজে কে না জানে? লিলি পর্য্যন্ত জানে। ভল্লুর সামান্য একটু পেটের অসুখ হইতে না হইতে কাকা তাহার সমস্ত প্রিয় খাদ্য বন্ধ করিয়া এমন সব কটু, তিক্ত, কষায় ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন যে সে কথা স্মরণ করিলেই অন্নপ্রাশনের অন্ন ঊর্দ্ধগামী হয়। তাহার উপর তিনি একজন কঠোর ব্রহ্মচারী, মাথায় একটি ক্ষুদ্র টিকি আছে। ভোর পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া স্নান করেন, তারপর ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া এমন ঘোব ববে কাঁসব-ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করেন যে পাডাব ত্রিসীমানার মধ্যে আব কাহাবও ঘুমাইবাব উপায় থাকে না।

শুধু ইহাই নয়, নব-পরিণীতা কাকিমার সঙ্গে তাঁহাব দুর্ব্যবহাব স্মরণ করিলেও তাঁহার নৈতিক দুর্গতি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। বিবাহের পূর্ব্বে বাড়ীসুদ্ধ লোকের সহিত কাকাব কথা কাটাকাটি বকাবকি চলিয়াছিল একথা ভল্লুর বেশ মনে আছে। যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত কাকা হাঁড়ির মত মুখ করিয়া বিবাহ করিতে গেলেন। কিন্তু বিবাহ কবিয়া আসিযা তিনি অন্দর মহলের সংস্রব একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। এই লইয়া বাড়ীতে অশান্তির শেষ নাই; ভল্লুর মা'র সহিত কাকার প্রায়ই বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। কাকা বাযস্কোপের দুষ্ট জমিদারের মত তির্য্যক্ হাসি হাসিয়া বলেন,—'আমি ত আগেই বলে দিয়েছিলুম!'

অথচ কাকিমা অতিশয় ভাল লোক; এতদিন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া ভল্লুর তাহা বুঝিতে বাকি নাই। লজঞ্চুস্ কিনিবার জন্য পয়সার প্রয়োজন হইলে তিনি চুপি চুপি তাহাকে পয়সা দেন;

এমন কি, চোরাই মাল তাঁহার কাছে গচ্ছিত রাখিলে তিনি কাহাকেও বলিয়া দেন না। একবার কতকগুলি ডাঁশা কুল ও খানিকটা কাসুন্দি চুরি করিয়া ভল্লু কাকিমার জিম্মায় রাখিয়াছিল, তিনি সমস্ত কুল ও কাসুন্দি যথাসময়ে তাহাকে প্রত্যার্পণ করিয়াছিলেন, একটি কুল বা একবিন্দু কাসুন্দিও আত্মসাৎ করেন নাই। এরূপ গুণবতী নারী আজকালকার দিনে কোথায় পাওয়া যায়? অন্ততঃ ভল্লুর জানা-শোনার মধ্যে এমন আর দ্বিতীয় নাই।

এ হেন কাকিমাকে কাকা অবহেলা করেন। শুধু অবহেলা করিলে ক্ষতি ছিল না, পরন্তু তিনি কাকিমার উপর অন্যায় উৎপীড়ন করিয়া থাকেন তাহাও সহজে অনুমান করা যায়। পূর্ব্বে দু'একবার কাকিমাকে বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইতে শুনিয়া ভল্লুর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে; আজ সে কাকিমার চক্ষে জল দেখিয়াছে। এসব কি মিছামিছি? ভল্লুর দৃঢ় ধারণা জন্মিল, কাকা সুবিধা পাইলেই আসিয়া কাকিমার কাণ মলিয়া চুল ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া যান। নচেৎ কাকিমা অকারণ কাঁদিবেন কেন?

যে-দিক দিয়াই দেখা যাক, কাকার মত দুর্নীতিপরায়ণ দমন-যোগ্য ব্যক্তি আর নাই।

কিন্তু দমন করিবার উপায় কি? দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গাছে ঝুলাইয়া দেওয়া বা তরবারি দিয়া মুণ্ডচ্ছেদ সম্ভব নয়। সে-চেষ্টা করিতে গেলে ভল্লুর জীবনের সুখ-শান্তি চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইবে। ক্রুদ্ধ কাকা হয়ত ভল্লুকে চিরজীবন ধরিয়া ভাত ডালের পরিবর্ত্তে গাঁদালের ঝোল ও বোতলের সুতিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই।

ভল্লু দীর্ঘকাল বদনমণ্ডল কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিল কিন্তু কাকাকে

জব্দ করিবার কোনও সহজ পন্থাই আবিষ্কৃত হইল না। তখন সে শাখা হইতে নামিয়া চিন্তাকুলচিত্তে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলিল। গামা এতক্ষণ বৃক্ষতলে লম্বমান হইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল, এখন উঠিয়া ডন্ ফেলার ভঙ্গীতে আলস্য ভাঙ্গিয়া প্রভুর অনুগামী হইল।

চন্দ্রমল্লিকা ফুলটি এতক্ষণ ভল্লুর হাতেই ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে সে তাহার গোটাকয়েক পাপ্‌ড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল; তবু ফুলের সৌষ্ঠব একেবারে নষ্ট হয় নাই। বাড়ীতে পৌছিয়া ভল্লু কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর অনিচ্ছাভরে উপরে কাকিমার ঘরের উদ্দেশ্যে চলিল।

বাড়ী তখনো নিঃশব্দ—বিশ্রামকারীরা বিশ্রাম করিতেছে। কাকিমার দরজার নিকট পর্য্যন্ত পৌছিয়া ভল্লু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কাকার কণ্ঠস্বর! কাকা চাপা অথচ উদাস স্বরে কথা কহিতেছেন। ভল্লু দরজার বাহিরে দেয়ালের সঙ্গে একেবারে সাঁটিয়া গিয়া শুনিতে লাগিল। কাকা বলিতেছেন,—'সংসারে আমার রুচি নেই। আমি একলা থাকতে চাই—ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সংসর্গে আসব না। কারণ, দেখেছি যারা স্ত্রীর প্রলোভনে প'ড়ে সংসারে জড়িয়ে পড়েছে, তাদের দ্বারা আর কোনও বড় কাজ হয় না।'

কাকা নীরব হইলেন; কিছুক্ষণ পরে কাকীমার অশ্রুরুদ্ধ অস্পষ্ট কণ্ঠ শুনা গেল,—'তবে বিয়ে করেছিলে কেন?'

'দাদা আর বৌদি'র কথা এড়াতে পারলুম না, তাই বিয়ে করতে হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে এই সর্ত্ত হয়েছিল যে, বিয়ে করেই আমি খালাস, তারপর আমার আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না। কিন্তু এখন দেখছি, তাঁরা আমায় ঠকিয়েছেন, সর্ত্তের কথা তাঁদের মনে নেই। কিন্তু সে যাক। একটা কথা তোমায় বলে দিই, মনে রেখো—আমার

কাছে তোমার কোনোদিন কিছুর প্রয়োজন হবে না, সুতরাং আমাকে ডাকাডাকি করে মিছে উত্যক্ত কোরো না।'

'আমি ত তোমাকে ডাকিনি—'

ভল্লু দেখিল তাহার স্থান-ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া নীচে চলিল। তাহার সামান্য একটা কথার সূত্র ধরিয়া কাকা কাকিমাকে তিরস্কার করিতেছেন, এখনি হয়ত সাক্ষী দিবার জন্য তাহার তলব পড়িবে। কাকার মত দুর্জ্জনের নিকট হইতে দূরে থাকাই নিরাপদ।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ভল্লু শুনিতে পাইল, তাহার মা নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া কাকাকে উদ্দেশ করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল স্বরে বলিতেছেন,—'ওমা—একি! সন্নিসি ঠাকুর একেবারে বৌয়ের ঘরে ঢুকে পড়েছ যে—'

নীচে নামিয়া ভল্লু দেখিল বাড়ীর ঝি বামা ভীষণ চেঁচামেচি সুরু করিয়া দিয়াছে ও একগাছা ঝাঁটা লইয়া গামাকে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার কথা হইতে ভল্লু বুঝিল যে, বামা ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ায় রৌদ্রে শুইয়া হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছিল, গামা গিয়া সস্নেহে তাহার মুখ-গহ্বরের অভ্যন্তরে জিহ্বা প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার আলজিভ্ চাটিয়া লইয়াছে। বামা গামার উদ্দেশে যে সব বিশেষণ নিক্ষেপ করিতেছে তাহা শুনিলে কুকুরেরও কর্ণেন্দ্রিয় লাল হইয়া উঠে।

ভল্লুও নিঃশব্দে গামাকে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। বামার আলজিভ্ চাটিয়া লওয়া যে গামার অন্যায় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু সব দোষ কি গামার? বামা হাঁ করিয়া ঘুমায় কেন? আর, গামার গলায় একটা বগ্‌লস্ থাকিলে ত এমন ব্যাপার ঘটিতে পারিত না, গামাকে তখন স্বচ্ছন্দে বাঁধিয়া রাখা চলিত! দোষ গামার

নয়,—দোষ বাড়ীর লোকের। তাহারা একটা বগ্‌লস্ কিনিয়া দেয় নাই কেন?

খুঁজিতে খুঁজিতে বাহিরের ঘরে কাকার তক্তাপোষের তলায় ভল্লু গামাকে আবিষ্কার করিল। গামা নিদ্রার ভাণ করিয়া এক চক্ষু ঈষৎ খুলিয়া মিটমিটি চাহিতেছিল, ভল্লুকে দেখিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ভল্লু গামার কাণ মলিয়া দিয়া চাপা তর্জ্জনে বলিল,—'পাজি কোথাকার! বামার মুখ এঁটো করে দিয়েছিস্ কেন?'

গামা বিনীতভাবে ল্যাজ নাড়িয়া অপরাধ স্বীকার করিল।

ভল্লু বলিল,—'মজা দেখাচ্চি দাঁড়াও, এবার থেকে তোমায় বেঁধে রাখব।'

গামা পুচ্ছ-স্পন্দনে কাতরতা জ্ঞাপন করিল।

ভল্লু কিন্তু শাসনে কঠোর। খানিকটা ছেঁড়া কাপড়ের পাড় সে অন্য প্রয়োজনে সংগ্রহ করিযাছিল, এখন তাহা পকেট হইতে বাহির করিল। সেটা গামার গলায় বাঁধিতে যাইবে এমন সময় হঠাৎ কাকার শয্যার উপর বালিশের পাশে একটা জিনিষ দেখিয়া তাহার চক্ষু পলকহীন হইয়া গেল। কাকার হাতঘড়িটা রহিয়াছে, ঘড়িতে চামড়ার বগ্‌লস্ সংলগ্ন। ব্যাণ্ড-শুদ্ধ রিষ্ট-ওয়াচ সে পূর্ব্বে দেখে নাই এমন নয়, বহুবার দেখিয়াছে; কিন্তু এখন তাহার মুগ্ধ নেত্র ঐ জিনিষটার উপর নিশ্চল হইয়া রহিল।

এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া সন্তর্পণে ভল্লু সোণার ঘড়িটি হাতে তুলিয়া লইল; তারপর ঘড়ি হইতে বগ্‌লস্ পৃথক করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। তখন ভল্লু একবার দরজার দিকে তাকাইয়া ঘড়িশুদ্ধ বগ্‌লস্ গামার গলায় পরাইয়া দিল। দিব্য মানাইয়াছে। ঘড়িটি গামার লোমে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে—দেখা যায়

না। ভল্লু আগ্রহ-কম্পিত হস্তে কাপড়ের পাড় বগলস্কে বাঁধিয়া অনিচ্ছুক গামাকে টানিতে টানিতে বাহির হইয়া পড়িল।

কাকা তখনও ফিরেন নাই, বোধ হয় মা'র সহিত তর্ক করিতেছেন। এই অবসরে ভল্লু বাগান অতিক্রম করিয়া একেবারে রাস্তায় গিয়া পড়িল।

* * * *

ভল্লু যখন বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভ্রমণের ফলে বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল; ভল্লু গামাকে একটি নিভৃত স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ীতে ঢুকিতেই মাংস রান্নার সুগন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। সে সটান রান্নাঘরে গিয়া বলিল,—'মা, ক্ষিদে পেয়েছে।' বলিয়া একটা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গেল। মা মাংস ও রুটি তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন।

নিবিষ্ট মনে আহার করিতে করিতে ভল্লু শুনিতে পাইল, বাড়ীতে একটা কিছু গণ্ডগোল চলিতেছে। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। কাকা চাকরদের ধমকাইতেছেন; একবার 'সোণার ঘড়ি' কথাটা শুনা গেল। ভল্লুর বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

তারপরই বামা ঝি রান্নাঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া উপু হইয়া বসিল, ভারী গলায় বলিল,—'এ ঐ দারোয়ান ড্যাক্‌রার কাজ, বলে দিলুম বড় মা, দেখে নিও। ও ছাড়া এত বুকের পাটা আর কারুর নয়।—কি অনাছিষ্টি কাণ্ড মা, ছোট দাদাবাবুর বিছানার ওপর থেকে সোণার ঘড়ি চুরি! আমি ত বার-বাড়ী মাড়াইনে সবাই জানে। রান্নাঘরে মুক্ত করে, বাসন মেজে, কাপড় কেচে, উঠান্ ঝাঁট দিতেই বেলা কেটে যায়—তা বাইরে যাব কখন? আর, এই এগারো বছর এ বাড়ীতে আছি, একটা কুটো হারিয়েছে কেউ বল্‌তে পারে না।—এ ঐ

ঝ্যাটাখেগো দারোয়ানের কাজ ; মিন্‌ষের মরণ-পালক উঠেছে কিনা, তাই মালিকের সোণার ঘড়িতে হাত দিতে গেছে !'

দারোয়ানের সঙ্গে বামার চিরশত্রুতা।

মা রান্না করিতেছিলেন, বামার সাফাই শুনিতে পাইলেও উত্তর দিলেন না। ভল্লুরও মুখ দেখিয়া মনের অবস্থা বুঝা গেল না। কিন্তু তাহার গলায় মাংসের টুক্‌রা আটকাইয়া যাইতে লাগিল। সে অতিকষ্টে আরও কিছু খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া পড়িল, পাতের ভুক্তাবশিষ্ট মাংস ও হাড় বাটিতে লইয়া ধীরে সুস্থে রান্নাঘর ত্যাগ করিল। প্রত্যহ দুইবেলা নিজের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সে স্বহস্তে গামাকে খাওযাইত।

গামাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে ভল্লু শুনিল কাকার কণ্ঠস্বর ও মেজাজ উত্তরোত্তর চড়িতেছে, তিনি পুলিসে খবর দিবেন বলিয়া চাকরদের ভয় দেখাইতেছেন। বাবাও সেই সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। চাকরেরা ভযে আড়ষ্ট ও নির্ব্বাক হইয়া আছে। ব্যাপার অতিশয গুরুতর হইয়াছে।

ভল্লু কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। গামার আহার শেষ হইলে সে তাহাকে লইয়া গুটি গুটি কাকার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ওদিকের বারান্দায় চেঁচামেচি চলিতেছে, এদিকে কেহ নাই। ভল্লু এপাশ ওপাশ চাহিয়া কাকার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ঘরটি অন্ধকার ; ভল্লু অন্ধকারে লুকাইয়া তাড়াতাড়ি গামার গলা হইতে ঘড়ি ও বগ্‌লস্ খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু বগ্‌লস্ গামার গলায় আঁটিয়া বসিযা গিয়াছে—বোধ করি গামা মাংস খাইয়া মোটা হইয়াছে। ভল্লু অনেক চেষ্টা করিযাও বগ্‌লস্ খুলিতে পারিল না, যতই তাড়াতাড়ি খুলিবার চেষ্টা করে, ততই হাত জড়াইয়া যায়। এদিকে সময় অতিশয় সংক্ষিপ্ত—এখনি হয়ত কেহ ঘরে আসিয়া ঢুকিবে।

ত্রস্ত ভল্লু কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় অতি সন্নিকটে কাকার গলা শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! মুহূর্ত্ত মধ্যে সে গামাকে তুলিয়া কাকার বিছানায় লেপের তলায় চাপা দিল, তারপর ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে কাটিয়া গেল। কাকা কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিলেন না, বকিতে বকিতে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

এইবার ভল্লুর সমস্ত সাহস হঠাৎ তাহাকে ত্যাগ করিল। তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তস্করবৃত্তি আপাত-লোভনীয় বটে কিন্তু চিত্তের শান্তিবিধায়ক নয়। কাকার কণ্ঠস্বর দূরে চলিয়া গেলে ভল্লু ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আর কোনোদিকে দৃকপাত না করিয়া একেবারে দ্বিতলে নিজের শয়ন কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। কাকিমা ঘরে ছিলেন, তাহাকে জুতা-মোজা ও গরম জামা খুলিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আজ পড়তে বস্‌লি না ভল্লু, এখনি শুতে এলি যে?'

'বড্ড ঘুম পাচ্ছে' বলিয়া ভল্লু লেপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

ওদিকে গামাও নরম বিছানায় লেপের মধ্যে শয়নের ব্যবস্থা দেখিয়া নিঃশব্দে পরম পরিতৃপ্তির সহিত কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রার আয়োজন করিল।

* * * *

ভল্লু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ঘুমাইবার পর হঠাৎ একটা বিরাট গর্জ্জন শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কাকিমাও ইতিমধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া তাহার পাশে আসিয়া শুইয়াছিলেন —তিনিও চমকিয়া উঠিলেন।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল; ভল্লু চোখ মেলিয়া দেখিল, কাকার

রুদ্রমূর্ত্তি ঠিক খাটের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে—হাতে একটা মোটা লাঠি। ভল্লু প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না, তারপর তাহার সব কথা মনে পড়িয়া গেল।

কাকা দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন,—'ভুলো, বেরিয়ে আয় শিগ্‌গির লেপ থেকে—আজ তোকে—'

ভল্লুর মুণ্ড এতক্ষণ লেপের বাহিরে ছিল, এখন তাহা ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল। সে কাকিমার বুকের কাছে ঘেঁষিয়া শুইল।

রাত্রি তখন মাত্র দশটা। ভল্লুর মা বাবা শয়ন করিতে গেলেও নিদ্রা যান নাই; তাঁহারা চেঁচামেচি শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। মা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি হয়েছে ঠাকুরপো?'

'হয়েছে আমার মাথা! ভুলো, বেরিয়ে আয় বলছি—'

মা শঙ্কিত হইয়া বলিলেন,—'কি করেছে ভল্লু?'

কাকা ক্রোধে হস্তদ্বয় আস্ফালন করিয়া বলিলেন,—'কি করেছে? ওর ঐ হতভাগা কুকুরটাকে আমার বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল; শুতে গিয়ে দেখি লক্ষ্মীছাড়া পেটরোগা কুকুর লেপ বিছানার সর্ব্বনাশ করে রেখেছে। বমি করে সব ভাসিয়ে দিয়েছে।'

শুনিয়া ভল্লুর মাথার চুল পর্য্যন্ত কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে কাকিমার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া একেবারে নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কাকিমার শরীরটা এই সময় একবার সজোরে নড়িয়া উঠিল, যেন তিনি হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ রকম ভয়ঙ্কর ব্যাপারে হাসিবার কি আছে তাহা ভল্লু ভাবিয়া পাইল না। গুরু ভোজনের ফলে গামা যে এমন বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড করিয়া বসিবে তাহা ভল্লু দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

কাকা পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন,—'শুধু কি তাই! কুকুরটাকে

ঘাড় ধরে তুলতে গিয়ে দেখি তিনি আমার রিষ্ট-ওয়াচ গলায় পরে বসে আছেন।'

ঘরের বাহিরে বাবা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; মা'র কলকণ্ঠ সেই সঙ্গে যোগ দিল। লেপের মধ্যে কাকিমার সর্ব্ব শরীর চাপা হাসির আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

কাকা বলিলেন,—'তোমাদের হাসি পাচ্ছে? ঐ ঘড়ির জন্যে চাকর-গুলোকে শুধু মারতে বাকি রেখেছি। ভাগ্যে পুলিসে খবর দেওয়া হয় নি, নয় ত কেলেঙ্কারির একশেষ হত; পুলিস এসে দেখত, কুকুরের গলায় ঘড়ি বাঁধা রয়েছে।—না, এ সব হাসির কথা নয়; ভুলোর বজ্জাতি বন্ধ করা দরকার।'

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'তা বেশ ত, কাল সকালে ওকে শাসন কোরো।'

কাকা বলিলেন,—'না বৌদি, সে হবে না। তুমি ওকে এখনি লেপের ভেতর থেকে বার করে আনো।'

মা মুখে আঁচল দিলেন, তারপর বলিলেন,—'কেন, তুমিই আনো না।'

'না না,—তুমি ওকে বিছানা থেকে বার করে আনো—তারপর আমি—'

'কেন বল ত? বিছানা ছুঁলে কি তোমার জাত যাবে?'

'না না—মানে—। আচ্ছা বেশ, কাল সকালেই হবে—' দ্বারের দিকে এক পা বাড়াইয়া কাকা দাঁড়াইলেন—'কিন্তু আমার বিছানা! আমি আজ শোব কোথায়?'

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বিছানা কি একেবারে গেছে?'

'শুধু বিছানা! সে-ঘরে ঢোকে কার সাধ্য।'

মা হাসিভরা মুখ গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—'তাই ত! বাড়ীতে ত আর লেপও নেই। তাহলে তোমাকে এই ঘরেই শুতে হয়।'

কাকা বলিলেন,—'এত রাত্রে ঠাট্টা ভাল লাগে না বৌদি। একটা লেপ বার করে দাও, বৈঠকখানায় ফরাসের ওপরেই শুয়ে থাকব।'

'আর ত লেপ নেই।'

'নেই!'

'একখানা বাড়তি ছিল, সেটা তুমি গায়ে দিচ্ছিলে। আর কোথায় পাব।'

কাকা রাগিয়া বলিলেন,—'এ তোমার দুষ্টুমি—আসল কথা দেবে না। উঃ—এই মেয়েমানুষ জাতটা—। বেশ, র‍্যাপার গায়ে দিয়েই শোব।' বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

মা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—'ছি ঠাকুরপো, ছেলেমানুষী কোরো না, আজ এই ঘরেই শোও। এই শীতে কেবল র‍্যাপার গায়ে দিয়ে শুলে অসুখে পড়বে যে।'

'তা হোক—হাত ছাড়।'

'লক্ষ্মী ভাই আমার, আজ রাতটা শোও—আমি ভল্লুকে আমার বিছানায় নিয়ে যাচ্ছি।'

'না।'

'তুমি সব বিষয়ে এত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ, আর এই সামান্য বিষয়ে এত অবুঝ হচ্চ! ধর্ম্ম-কর্ম্মে তোমার এত নিষ্ঠে, আর যাকে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছ তাকে হেনস্থা করলে পাপ হয়, এটা বুঝতে পার না?'

'সে দোষ আমার নয়—তোমাদের। আমি বিয়ে করতে চাই নি।'

'বেশ, দোষ আমাদের, আমি ঘাট মান্‌ছি। কিন্তু বৌ ত কোনো দোষ করেনি।'

কাকা উত্তর দিলেন না, হাত ছাড়াইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া গেলে মা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—'মায়া, জেগে আছ নাকি?'

কাকিমাও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—'হ্যাঁ।'

মা কিছু বলিলেন না, আরও কিছুক্ষণ দাড়াইয়া থাকিয়া আবার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

চারিদিক হইতে এই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলাফেলি দেখিয়া ভল্লুর খুল্লতাত-ভীতি অনেকটা কাটিয়া গেল। সে লেপের ভিতর হইতে মুণ্ড বাহির করিল। দেখিল, কাকিমা আলোর দিকে তাকাইয়া আছেন, তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

কাকার নিষ্ঠুরতাই এই অশ্রুজলের হেতু তাহাতে সংশয় নাই। ভল্লু বিছানায় উঠিয়া বসিল, আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল,—'কাকিমা!'

চোখ মুছিয়া কাকিমা বলিলেন,—'কি?'

ভল্লু বলিল,—'কাকা নড়াধম—না?'

কাকিমা উত্তর দিলেন না।

ভল্লু আবার বলিল,—'কাকা কারুর কথা শোনে না। মা'র কথা শোনে না, বাবার কথা শোনে না, তোমার কথা শোনে না—খালি আমাকে বকে। কাকা নড়াধম।'

কাকিমা এবারও তাহার কথায় সায় দিলেন না, তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ভাঙা ভাঙা গলায় বলিলেন,—ঘুমো ভল্লু, অনেক রাত হয়েছে।'

ভল্লু শুইল বটে কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। কাঁচা ঘুমের উপর

কাকার উগ্র অভিযানে তাহার ঘুম চটিয়া গিয়াছিল; সে নীরবে শুইয়া ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে এগারোটা বাজিয়া গেল; ঠং করিয়া সাড়ে এগারোটা বাজিল। তবু ভল্লুর চোখে ঘুম নাই। সে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করিতেছে। কাকিমা অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে বুক-ভাঙা নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শেষে বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ভল্লু একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তাঁহার চক্ষু মুদিত, তিনি শান্তভাবে নিশ্বাস ফেলিতেছেন।

কাকিমার মুখের দিকে চাহিয়া ভল্লুর কাকার উপর ক্রোধ ও বিদ্বেষ আরো বাড়িয়া গেল। ডাকাত সর্দ্দারের আর কত সহ্য হয়! আজ দ্বিপ্রহর হইতে যে অমানুষিক অত্যাচার তাহার উপর হইয়াছে, তাহা না হয় সে সহ্য করিয়াছে; তাহার সাধের তরবারিটা ভাঙিয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে তবু সে কিছু বলে নাই। কিন্তু কাকিমার প্রতি এই নিষ্ঠুরতা—নারী নির্য্যাতন—! সে কি করিয়া বরদাস্ত করিবে? ভল্লুর ক্ষুদ্র প্রাণের সমস্ত chivalry সঙ্গীন উঁচাইয়া খাড়া হইয়া উঠিল। যায় প্রাণ যাক্ প্রাণ—ভল্লু কাকাকে শাসন করিবেই!

কিন্তু—

প্রতিহিংসার কল্পনায় রাত্রি জাগরণ করা যত সহজ, কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। উপায় চিন্তা করিতে করিতে ভল্লুর ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

অবশেষে দীর্ঘ জটিল চিন্তার পর ভল্লু সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। তাহার অধরে একটু হাসি দেখা দিল।

কাকা কাকিমার উপর অত্যাচার করেন বটে—কিন্তু দূর হইতে। ইহার প্রকৃত কারণ, তিনি কাকিমাকে ভয় করেন। বাড়ীর মধ্যে

কাকা কেবল কাকিমাকেই ভয় করেন। প্রমাণ, কাকিমা এ বাড়ীতে আসার পর হইতে কাকা নিজের ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন; এমন কি বিছানা স্পর্শ করিবার সাহস পর্য্যন্ত তাঁহার নাই। মুখে তিনি যতই বীরত্ব প্রকাশ করুন না কেন, কাকিমার ভয়ে তিনি সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া আছেন। নচেৎ বাড়ীশুদ্ধ লোকের এত সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও তিনি কাকিমার সংস্পর্শে আসিতে গররাজি কেন?

এরূপ ক্ষেত্রে কাকাকে জব্দ করিবার একমাত্র উপায়—

ভল্লুর মুখের হাসি আরও বিস্তার লাভ করিল। সে ধীরে ধীরে শয্যা হইতে নামিল—কাকিমা জাগিলেন না। ঘড়িতে বারোটা বাজিল।

বিছানা ও লেপের তপ্ত আয়েস ত্যাগ করিতে তাহার কষ্ট হইল; কিন্তু সঙ্কল্পিত কর্ত্তব্য পালন করিতে ভল্লু কোন সময়েই পরাঙ্মুখ নয়। সে নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘরের বাহির হইল।

বাড়ী অন্ধকার। কোন্ অদৃশ্য স্থান হইতে একটা মট্ মট্ শব্দ আসিতেছে—যেন কে অন্ধকারে বসিয়া আঙুল মট্কাইতেছে। ভল্লুর বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল; সে কিছুক্ষণ দুই মুঠি শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শব্দটা অপ্রাকৃত নয়, একটা দরজার তক্তায় কীট গর্ত্ত করিতেছে। ভল্লু ধীরে ধীরে রুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিল। কিন্তু ভয় বস্তুটা এমনি যে বাস্তব অবাস্তবের অপেক্ষা রাখে না,—অন্ধকারে নিজের পদশব্দও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ভল্লুর প্রবল ইচ্ছা হইল, ফিরিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে,—কাজ নাই আর কাকাকে শাসন করিয়া। কিন্তু সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া মনে মনে বলিল,—'আমি ভল্লু সর্দ্দার! আমি কাউকে ভয় করি না—কিচ্ছু ভয় করি না—'

তথাপি, চক্ষু দুটি দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়াই ভল্লু সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া চলিল। নিতান্ত পরিচিত পথ, তাই কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না। অবশেষে, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বৈঠকখানার দ্বারে উপস্থিত হইল।

ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছে। ভল্লু দেখিল, আপাদমস্তকে র‍্যাপার মুড়ি দিয়া কাকা প্রায় গামার মতই কুণ্ডলিত হইয়া শুইয়া আছেন।

ভল্লু কাকার গা ঠেলিয়া ডাকিল,—'কাকা।'

কাকা চমকিয়া উঠিলেন,—'অ্যাঁ—কে!'—ভল্লুকে দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—'কি হয়েছে রে!'

শীতের সহিত অন্যান্য মানসিক আবেগ মিশ্রিত হইয়া ভল্লুর দন্তবাদ্য আরম্ভ হইয়াছিল, সে বলিল,—'কাকিমার অসুখ করেছে—ত্‌তুমি শিগ্‌গির চল—'

'কি হয়েছে?'

ভল্লু বিপদে পড়িল। রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে সে আগে চিন্তা করে নাই; অথচ কাকা ডাক্তার তাঁহাকে বাজে কথা বলিয়া প্রতারিত করা চলিবে না। পূর্ব্বে কয়েকবার কাল্পনিক রোগের উল্লেখ করিয়া ভল্লু ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

হঠাৎ তাহার একটা রোগের কথা মনে পড়িয়া গেল। কয়েক মাস আগে লিলির ঐ রোগ হইয়াছিল, (স্যাণ্টোনিন প্রয়োগে আরাম হয়)। লিলির যে রোগ হইয়াছিল তাহা কাকিমার হইতে বাধা নাই—বিশেষতঃ যখন উভয়েই মেয়েমানুষ। ভল্লু ঢোক গিলিয়া বলিল,—'দাঁত কিড়্‌মিড়্ করছেন।'

দাঁত কিড়্‌মিড়্ করিতেছে! হিষ্টিরিয়া নাকি? কাকা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এত রাত্রে—! বিচিত্র নয়। আজ রাত্রে ঐ সব বকাবকির পর—হয়ত—

কাকা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আর কি করছে ?'

'আর কিছু না—শুয়ে আছেন।'

হুঁ—হিষ্টিরিয়াই বটে! কাকা একটু দ্বিধা করিলেন। কিন্তু অনুতপ্ত মানুষের কাছে কঠোর ব্রহ্মচারীর পরাজয় হইল। তিনি আলমারি হইতে একটা বেঁটে সবুজ রংয়ের শিশি লইয়া সংক্ষেপে বলিলেন,—'চল্।'

ভল্লুর বুকের ভিতর ধড়াস-ধড়াস করিতে লাগিল। কঠিন ও বিপজ্জনক কার্য্য ফলনোন্মুখ হইলে ঐরূপ সকলেরই হয়। সে নিঃশব্দে কাকার অনুসরণ করিল।

কাকা উপরে উঠিয়া ঘরের দ্বারের সম্মুখে একবার দাঁড়াইলেন; তারপর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

খাটের পাশে দাঁড়াইয়া রোগিণীর অনাবৃত মুখের দিকে চাহিতেই একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব মধুর অনুভূতি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া গেল। কিন্তু তিনি তখনই মনকে যথোচিত কঠিন করিয়া হস্তস্থ শিশির মুখ খুলিয়া রোগিণীর নাকের সম্মুখে ধরিলেন।

কাকিমা শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময় দ্বারের কাছে খুট্ করিয়া শব্দ হইল। কাকা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন—দ্বার বন্ধ; ভল্লু ঘরে নাই।

তিনি এক লাফে গিয়া দরজায় টান মারিলেন—দরজা খুলিল না। বাহির হইতে শিকল লাগান।

কাকা চাপা গর্জ্জনে বলিলেন,—'ভল্লু! শিগ্‌গির দোর খোল্ পাজি—নৈলে খুন করব।'

কিন্তু ভল্লু তখন পাশের ঘরে গিয়া বাবার লেপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

*   *   *   *

পরদিন ভোর হইতে না হইতে ভল্লুর ঘুম ভাঙিল।

মা বাবা তখনো সুপ্ত ; ভল্লু চুপি চুপি উঠিয়া বাহিরে আসিল।

কাকিমার দরজা তেমনি বাহির হইতে শিকল লাগান, অর্থাৎ কাকা সারারাত্রি বাহির হইতে পারেন নাই। বিজয়গর্ব্বে ভল্লু সর্দ্দারের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; সে নির্জনে একবার কিরাত নৃত্য নাচিয়া লইল। ভবিষ্যতে তাহার ভাগ্যে যাহা আছে তাহা তো আছেই, তাই বলিয়া বর্ত্তমানের বিজয়োল্লাস তো আর দমন করিয়া রাখা যায় না।

কিন্তু কাকা কিরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন তাহা স্বচক্ষে দেখিবার লোভও সে সম্বরণ করিতে পারিল না। জানালায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল—ভল্লু তাহাতে চোখ লাগাইয়া উঁকি মারিল।

যাহা দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত বিস্ময়ে চক্ষু চক্রাকার করিয়া ভল্লু সরিয়া আসিল। তারপর দৌড়িতে দৌড়িতে মা'র ঘরে ফিরিয়া গেল। ঘুমন্ত মা'কে নাড়া দিয়া জাগাইতে জাগাইতে উত্তেজনা-সংহত কণ্ঠে বলিল,—'মা! মা! কাকা কাকিমাকে তিন্‌টে-পাঁচটা চুমু খাচ্ছেন।'

১০ই চৈত্র, ১৩৪১

ইতর-ভদ্র

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় রসা রোডে প্রফেসার সরকারের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সমরেশ বাসায় ফিরিতেছিল। অনেকটা পথ যাইতে হইবে, তাহার বাসা মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে, কিন্তু এত রাত্রে ট্রাম ও বাসের যাতায়াত কমিয়া আসিয়াছিল; তবু কোনো একটা বাহন পাইবার আশায় সমরেশ ক্লান্তভাবে চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল।

পাশ দিয়া দুটা খালি বাস চলিয়া গেল, একটা শূন্য ট্যাক্সির চালক সতৃষ্ণভাবে তাহার দিকে তাকাইতে তাকাইতে ধীরগতিতে বাহির হইয়া গেল। সমরেশ লক্ষ্য করিল না।

এইরূপ অসামান্য অমনোযোগের কারণ, আজ তাহার জীবনে ঘৃণা হইয়া গিয়াছিল। সে অত্যন্ত হতাশ ভাবে এই কথাটাই তোলাপাড়া করিতে করিতে চলিয়াছিল, যে, সে ভদ্রলোক নয় এবং কোনো কালেই ভদ্রলোক হইতে পারিবে না। সুতরাং তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা না থাকা দুই সমান।

বাপের পয়সা থাকিলেই যে ভদ্রলোক হওয়া যায় না একথা কে না জানে? প্রকৃত ভদ্রলোক হইতে হইলে আরো কতকগুলি সদ্‌গুণের আবশ্যক। বিলাতী মতে জেণ্টল্‌ম্যান্ বলিতে কতকগুলা সদাচারের সমষ্টি বুঝায়, আমাদের দেশীশাস্ত্রেও আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা শিষ্টতার একটা আদর্শ খাড়া করা হইয়াছে। সমরেশ বিবেচনা করিয়া দেখিল, সেরূপ গুণ তাহার একটিও নাই। বস্তুতঃ সে যে ভদ্রলোক নয়, এ সন্দেহ তাহার বহুপূর্ব্বেই জন্মিয়াছিল কিন্তু আজ তাহা একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ সে স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহজ ভাবে কথা কহিতে পারে না কেন? অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে যদি বা পারে, সুষমাকে দেখিলেই তাহার বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হয় কেন? তাহার বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি না থাকিলে কেহ বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে না। তবু সুষমার সঙ্গে কথা কহিবার একটা দূর সম্ভাবনা উদয় হইবামাত্র তাহার বাহ্যেন্দ্রিয়গুলা এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি-সুদ্ধি অমন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় কেন?

দ্বিতীয় কথা ভূপেন নামধারী তাহার যে একজন সহপাঠী আছে, যাহার সহিত গত চার বৎসর যাবৎ সে বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিতেছে, তাহাকে দেখিবামাত্র আজকাল তাহার মাথায় খুন চড়িয়া যায় কেন? ভূপেন অত্যন্ত মিশুক এবং স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা কহিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে মুখ খারাপ করিয়া গালি দিবাব প্রবৃত্তি কোন ভদ্রলোকের হইয়া থাকে?

তৃতীয় কথাটা আজ প্রফেসার সরকারের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া অত্যন্ত রূঢ় এবং লজ্জাকর ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে,—তাহা এই যে, সমরেশ শিক্ষিত ভদ্রসমাজে বিচরণ করিবার মত শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা কিছুই জানে না। ইহার পর নিজেকে ভদ্রলোক বলিয়া পরের কাছে ঘোষণা করা দূরের কথা, নিজের কাছে স্বীকার করাও সমরেশের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

নিজের সামাজিক চালচলন নিরপেক্ষভাবে অন্যের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিবার উপযুক্ত অন্তর্দৃষ্টি অনেকেরই থাকে না; সমরেশের সেটা ছিল। তাই সে আজ নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে ভদ্রলোক নয়। কিন্তু ও কথাটা অনেকবার বলা হইয়া গিয়াছে।

এই সূত্রে কিন্তু একটা কথা আজ সমরেশের কিছুতেই মনে পড়িল না ; মনে পড়িলে তাহার মন নিশ্চয় অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যাইত। বছর দুয়েক আগে তাহার কলেজের জনৈক সাহেব প্রফেসার অন্যান্য কয়েকটি ভাল ছেলের সঙ্গে তাহাকেও ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। খাইতে গিয়া সমরেশ দেখিল টেবিলের উপর ডিনার পরিবেষণ হইয়াছে এবং ছুরি কাঁটা দিয়া খাইবার ব্যবস্থা। তাহা দেখিয়া সে বলিয়াছিল,—স্যার, ছুরি কাঁটা চালাতে ত জানি না, খাব কেমন করে ?

পাদ্রী প্রফেসার হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—যেমন করে খেয়ে থাকো তেমনি করে খাবে ; ভগবান তোমাকে অতগুলো আঙুল দিয়েছেন কি জন্যে ?

সমরেশ মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল,—না স্যার তা হতে পারে না, ছুরি কাঁটা দিয়েই খাব। আপনারা কিন্তু হাস্‌তে পাবেন না।

সেদিন সমরেশ ছুরি কাঁটা দিয়াই খাইয়াছিল এবং তাহার খাইবার ভঙ্গী দেখিয়া প্রফেসার সাহেব ও অন্যান্য ক্রিশ্চান ছেলেরা খুব হাসিয়াছিল। কিন্তু সমরেশ তিলমাত্র লজ্জা বা ক্ষোভ অনুভব করে নাই বরং নিজেও হাসিয়া বলিয়াছিল,—প্রথমবারেই কি হয়। আবার নিমন্ত্রণ করে দেখ্‌বেন, স্যার, টেব্‌ল্‌-ম্যানার্স সব দুরস্ত হয়ে গেছে।

যাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় অধীর হইয়া ভাবিতেছেন—কথাটা কি ?

কথাটা সেই পুরাতন কথা। পৃথিবীতে যখন ভদ্রলোক বলিয়া কোনো জীবের বাস ছিল না তখন এ কাহিনীর আরম্ভ হইয়াছিল, এবং ঐ জীবটী পৃথিবী হইতে যখন মরিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে তখনো এ কাহিনীর সমাপ্তি হইবে না।

কিন্তু একেবারে আদিম কাল হইতে না হোক ব্যাপারটা আর একটু আগে হইতে বলা দরকার।

সমরেশ কলিকাতার ছেলে নয়, তাহার বাপ বাঙলা দেশেরই কোনো একটা বড় সহরের একজন বিখ্যাত ডাক্তার। সমরেশ যখন সম্মানের সহিত প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইল তখন তিনি তাহাকে কলিকাতায় একটা বাসা করিয়া দিয়া কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া গেলেন। সমরেশ একাকী বাসায় থাকিয়া গভীর মনঃসংযোগে পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিল এবং নিয়মিত কলেজ যাইতে লাগিল।

আই-এ পরীক্ষায় সমরেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। যে ছেলেটি ফার্ষ্ট হইল তাহার নাম ভূপেন ঘোষ। ভূপেনকে সমরেশ কখনো চোখে দেখে নাই—ভূপেন অন্য কলেজের ছাত্র,—কিন্তু আগামীবারে তাহাকে পরাস্ত করিবার জন্য সে সুরু হইতেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

বি-এ পরীক্ষায় সমরেশ ফার্ষ্ট হইল, ভূপেন দ্বিতীয় স্থান পাইল। তারপর এম-এ পড়িবার সময় দুইজনে একই কলেজে নাম লিখাইল। দুইজনেরই একই বিষয়,—এক্সপেরিমেণ্টাল্ সাইকলজি। প্রথম কিছুদিন দুইজনে একটু দূরে দূরে রহিল, তারপর সামান্য একটু আলাপ হইল। ভূপেন অত্যন্ত সৌখীন ও মার্জ্জিত ভাবের ছোকরা কিন্তু সে-ই যাচিয়া আলাপ করিল,—'আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া সৌভাগ্য বলে মনে করি।'

সমরেশ হাসিয়া উত্তর করিল,—'সেটা উভয়তঃ। গোড়া থেকে যাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে তাঁকে জানবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। এ ভালই হল আমাদের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌ছে। এবার কিন্তু আপনার পালা।'

ভূপেন বলিল,—'এ দ্বন্দ্বে আমার দিক থেকে কোনো গ্লানি নেই, আছে শুধু প্রতিযোগিতার উদ্দীপনা।'

সমবেশ বলিল,—'এ পক্ষেও তাই। হারলে অপমান নেই কিন্তু জিতলে আনন্দ আছে।'

পরিচয় কিন্তু ইহার বেশী অগ্রসর হইতে পাইল না। হঠাৎ একদিন মেয়েলি হাতের একটি ক্ষুদ্র কাঁচি ইহাদের মধ্যেকার ক্ষীণ যোগসূত্রটিকে কাটিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া দিল।

সুষমা প্রফেসার সরকারের ভাগিনেয়ী—বয়স আঠারো বৎসর। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত তার চেহারা। সে জুতামোজা পরে, একাকিনী পথ দিয়া সোজা হাঁটিয়া যায় এবং প্রয়োজন হইলেই অন্য দেশী চালে কথাবার্ত্তা বলে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা। অন্ততঃ সমবেশ আজ পর্য্যন্ত তাহার অন্য উপমা খুঁজিয়া পায় নাই। সে কালো কি ফর্সা, সুন্দরী কি মাঝারি, ব্লণ্ড কি ব্রুনেট এ সব কথা ভাবিয়া দেখিবার বেচারা অবসর পায় নাই। এ বিষয়ে বিশ্লেষণ-শক্তি প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই মুকুলে ঝরিয়া গিয়াছিল।

সুষমা আই-এ পাশ করিয়া বেথুন কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়িতেছে; সে হপ্তার মধ্যে দুতিন দিন মামার লেকচার শুনিতে আসিত, প্রফেসার সরকার অনুমতি দিয়াছিলেন। মামার ক্লাশে ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম, গুটি সাত-আটের বেশী নয়। তাহাদেরই মধ্যে একটু তফাতে বসিয়া সুষমা একাগ্রমনে মামার উপদেশ শুনিত এবং ঘণ্টা বাজিলে কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত উঠিয়া চলিয়া যাইত। দোতলা হইতে সিঁড়ি দিয়া দ্রুত লঘুপদে নামিয়া ফুটপাথের উপর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত, পথে ট্যাক্সি দেখিলে সেই ট্যাক্সিতে চড়িয়া বাড়ী

যাইত। তাহার বাড়ী সহরের উত্তর দিকে, বোধ হয় হাতীবাগান অঞ্চলে। ক্লাশের একটি ছাত্র বিশেষ করিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল।

মনস্তত্ত্ব ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে অকস্মাৎ এই মেয়েটির অকুণ্ঠিত আগমনে এমন একটি মনস্তত্ত্বের সৃষ্টি হইল যাহা প্রফেসার সরকারের জ্ঞানগর্ভ লেকচারের বিষয়ীভূত নয়।

ভূপেনের সহিত মেয়েটির বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। কারণ, সমরেশ লক্ষ্য করিল, প্রথম দিন সুষমা ক্লাশে পদার্পণ করিতেই ভূপেন তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। সুষমাও মৃদু হাসিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিল। অপরিচিত যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া কোনো ভদ্রমহিলাই হাসে না সুতরাং সমরেশের অনুমান যে অভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু আলাপ যে খুব ঘনীভূত নয় তাহা বুঝিয়া সমরেশ অনেকটা স্বস্তি অনুভব করিল। প্রফেসার ক্লাশে আসিবার পূর্ব্বে কখনো কখনো ভূপেন গায়ে পড়িয়া মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু আলাপ 'কেমন আছেন' 'ভাল আছি'র বেশী কোনদিনই অগ্রসর হইত না, হয় প্রফেসার আসিয়া পড়িতেন নয় সুষমা পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করিত। সমরেশ দূর হইতে তাহাদের কথার মৃদুগুঞ্জন উৎকর্ণ হইয়া শুনিত এবং মনে মনে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত

এইভাবে মাসদুই কাটিবার পর একদিন বেলা তিনটার সময় একটা ব্যাপার ঘটিল। ব্যাপার এমন কিছু গুরুতর নয় কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর অন্ধ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে প্রফেসার সরকার যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত বড় একটা চোখে পড়ে না।

একটা ক্লাশ শেষ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় ক্লাশের প্রতীক্ষায় সমরেশ দোতলার সিঁড়ির ঠিক নীচেই অন্যমনস্ক ভাবে পায়চারি করিতেছিল।

সুষমা মামার সহিত কি একটা কথা কহিবার পর অভ্যাসমত দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছিল হঠাৎ সিঁড়ির শেষ ধাপে আসিয়া তাহার পা পিছলাইয়া গেল। সে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, আত্মরক্ষার চিন্তাহীন তাড়নায় সম্মুখস্থ সমরেশের গলা জড়াইয়া ধরিল। হঠাৎ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সমরেশ কাঠের খোঁটার মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং একটীও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিল না।

দারুণ লজ্জায় সমরেশের গলা ছাড়িয়া দিতেই সুষমা আবার পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। মাথার মধ্যে বুদ্ধি নামক যে একটি পদার্থ আছে তাহা সমরেশের সম্পূর্ণ বিস্মরণ হইয়াছিল, তবু সে না বুঝিয়া সুঝিয়াই সুষমার একখানা হাত টানিয়া ধরিয়া রহিল।

ক্লিষ্ট হাসিয়া সুষমা বলিল,—'পা মচ্‌কে গেছে।'

সমরেশ নির্ব্বাক হইয়া রহিল, বিস্ময়ের চিহ্ন ভিন্ন তাহার মুখে আর কিছুই প্রকাশ পাইল না।

এমন সময় ভূপেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—'এ কি! পড়ে গেছেন নাকি? দেখি দেখি, তাইত! অ্যাঙ্‌ক্‌ল্‌ স্প্রেন হয়েছে দেখছি! এরি মধ্যে ফুলে উঠেছে। নিন্, আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ান, এখন লজ্জা করবার সময় নয়।—মিত্তির, একটা ট্যাক্সি।'

মিত্তির, অর্থাৎ সমরেশ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিয়া ট্যাক্সি ডাকিতে ছুটিল।

ট্যাক্সি আসিলে সুষমা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ভূপেনের স্কন্ধে ভর দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ভূপেনও তাহার পিছন পিছন গাড়ীতে গিয়া উঠিল, চালককে বলিল,—'চালাও হাতীবাগান, জল্‌দি।'

সুষমা আপত্তি করিয়া বলিল,—'আপনার যাবার দরকার নেই—'

ভূপেন বলিল,—'বিলক্ষণ! আপনি গাড়ী থেকে নামবেন কি করে?'

পায়ের যন্ত্রণায় সুষমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কথা কাটাকাটি করিবার তাহার শক্তি ছিল না, সে সমরেশের দিকে ফিরিয়া হাসিবার একটা চেষ্টা করিয়া বলিল,—'ধন্যবাদ সমরেশবাবু' বলিয়া দুই করতল একবার যুক্ত করিল।

প্রত্যুত্তরে সমরেশের মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—'না না, না'—কিন্তু তখন ট্যাক্সি চলিয়া গিয়াছে।

সমরেশ ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিল, মিনিট খানেক পরে তাহার স্মরণ হইল যে সুষমার নমস্কারের প্রতিনমস্কার করা হয় নাই।

সেদিন আর ক্লাশ করা হইল না। বাড়ী ফিরিবার পথে সমস্ত ব্যাপারটাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া সমরেশ তাহার মধ্যে নিজের গৌরবসূচক একটা ঘটনাও খুঁজিয়া পাইল না এবং অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল যে সে এখনো ভদ্রলোক হইতে পারে নাই। কোন্ সময় কি বলা এবং কি করা উচিত ছিল, তাহার একটা জীবন্ত অভিনয় তাহার মনের চিত্রপটের উপর খেলিয়া গেল। কিন্তু তখন আর উপায় নাই। তিথি অনুকূল ছিল বটে কিন্তু শুভলগ্ন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া, সমরেশের কল্পনার রঙ্গমঞ্চে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির বহুবার পুনরভিনয় হইয়া গেল। এবং এই অভিনয়ে সে এমন বাগ্মিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি দেখাইল, সুষমার প্রতি কথার এমন সুন্দর ও সরস উত্তর দিল যে সে নিজেই বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এমন চমৎকার ভাবে কথা কহিবার বুদ্ধি যখন তাহার আছে তখন কাজের বেলায় শুধু না না না ছাড়া আর কিছুই সে বলিতে পারিল না কেন?

আর একটা কথা, হতভাগা ভূপেনটা ঠিক সেই সময় কোথা হইতে

আসিয়া জুটিল! সে অমন অতর্কিতে আসিয়া পড়িয়া নির্লজ্জভাবে বাক্যচ্ছটা বিস্তার না করিলে ত সমরেশ এমন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িত না। ভূপেন যেন ইচ্ছা করিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্যই এমনটা করিয়াছে। আর, ট্যাক্সিতে চড়িয়া সুষমার সঙ্গে যাইবার কি দরকার ছিল? গাড়ী হইতে সুষমা নামিতে পারুক না পারুক ভূপেনের কি? অসভ্য বর্ব্বর কোথাকার!

সমরেশ নিজে ভদ্রলোক না হইতে পারে কিন্তু ভূপেনটা যে তাহার চেয়েও ছোটলোক, উপরন্তু নির্লজ্জ এবং বেয়াদব তাহাতে সমরেশের সন্দেহ রহিল না।

তবু এইরূপ আত্মগ্লানি ও বিদ্বেষের মধ্যে দুটি জিনিষ তাহার মনে শেষরাত্রির সুখস্বপ্নের মত জড়াইয়া রহিল। একটি, সুষমা তাহার নাম জানে, নিশ্চয় মামার নিকট তাহার বিষয় শুনিয়াছে। দ্বিতীয়,—নিজের কণ্ঠদেশে সুষমার ভয়ব্যাকুল বাহুর নিবিড় বন্ধনের স্পর্শানুভূতি।

ইহার পর একমাস সুষমা আসিল না। পায়ের জন্যই আসিতে পারিতেছে না তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রফেসার সরকারকে স্বচ্ছন্দে সুষমার কুশলপ্রশ্ন করা যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি মুখে কিছু না বলুন মনে মনেও ত ভাবিতে পারেন,—সুষমার জন্য তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন হে বাপু? এই লজ্জায় সমরেশ তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

কিন্তু ভূপেন যে সুষমা সম্বন্ধে সংবাদ রাখে তাহা সে বুঝিয়াছিল। কোন্ অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাবে বুঝিয়াছিল বলা যায় না; কিন্তু নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল। সুতরাং ভূপেনকে জিজ্ঞাসা করিলেই সুষমার খবর পাওয়া যাইবে তাহাও একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তবু সমরেশ ভূপেনকে প্রশ্ন করিল না, ভূপেনের মারফতে সুষমার কুশল জানিবার

হীনতা সে ঘৃণার সহিত বর্জ্জন করিল। উপরন্তু ভূপেনের সহিত পূর্ব্বে যা দু'একটা কথা হইত তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু সর্ব্বদা আত্মবিশ্লেষণ করা যাহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে তাহার পক্ষে মনকে চোখ ঠারা চলে না। ভূপেনের প্রতি বিদ্বেষের মূলে যে ভূপেনের কোনো সত্যকার অপরাধ নাই বরঞ্চ নিজের অক্ষমতাই নিহিত আছে, এই নিগূঢ় সত্যটি গোপন কাঁটার মত নিরন্তর সমরেশের বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করিতে লাগিল।

পা ভাল হইবার পর সুষমা যেদিন প্রথম কলেজে আসিল সেদিন সমরেশ দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, সুষমা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া সম্মুখেই সমরেশকে দেখিয়া সহাস্যমুখে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। দুটি হাত একত্র করিয়া একটি নমস্কার করিয়া বলিল,—'একমাস আসতে পারিনি—আপনারা নিশ্চয় খুব এগিয়ে গেছেন। এখন আপনাদের নাগাল পাওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে সমরেশবাবু?'

সমরেশ একেবারেই তৈরী ছিল না, তাহার কাণ দুটা লাল হইয়া অসম্ভব রকম ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। এবং তালু হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল।

সুষমা বলিল,—'আপনার নোটগুলো আমায় একবার দেখাবেন, যতটা পারি টুকে নেব। মাস্টার ত লেখা নোট নেই—মুখে মুখে যা ডিক্‌টেট্ করেন।'

সমরেশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, তারপর একবার কাশিয়া ভগ্নস্বরে কহিল,—'আপনার পা—আপনার পায়ের—'

সুষমা যেন শুনিতে পায় নাই এমনিভাবে বলিল,—'নোটগুলো দেবেন, কৃপণতা করবেন না যেন।' বলিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল।

সমরেশ পুনরায় ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—এবার গলার স্বর অনেকটা সাফ্ হইয়াছে,—'আপনার পা এখন বেশ—'এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হঠাৎ একেবারে মূক হইয়া গেল। সুষমার মুখের উপর লজ্জার যে অরুণাভা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহার কারণটা সহসা বিদ্যুৎচমকের মত বিকশিত হইয়া যেন তাহার মস্তিষ্কে পুড়াইয়া দিয়া গেল। পা-মচকানোর সঙ্গে এমন একটা দৈবাৎকৃত লজ্জাকর ঘটনা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত হইয়া আছে যাহার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত সুষমার পক্ষে মস্ত সঙ্কোচের কারণ হইতে পারে, তাহা আচম্বিতে স্মরণ করিয়া সমরেশের জিহ্বা একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। সুষমা চলিয়া যাইবার পর সে বারম্বার নিজের মস্তকের উপর অশনিসম্পাত কামনা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, এত বড় গাধা গরু গবেশের মত প্রশ্ন সে করিতে গেল কেন? তাছাড়া স্ত্রীলোকের পায়ের সম্বন্ধে কোনোপ্রকার কৌতূহলই যে ঘোর অশ্লীলতা।

ক্লাশ শেষ হইবার পর সুষমার সহিত সমরেশের আবার চোখাচোখি হইল। সুষমা আবার হাসিমুখে বলিল,—'সমরেশবাবু, ভুলবেন না যেন। কাল ত আমি আসব না, পরশু যেন খাতাগুলো পাই।'

সমরেশ অতিমাত্রায় লাল হইয়া উঠিয়া বলিল,—'আচ্ছা—নিশ্চয়! সে আর আপনাকে—তা বেশ ত, কালই আমি—'

ভূপেন আসিয়া তাহাদের মধ্যে যোগ দিয়া বলিল,—'কোন্ খাতার কথা বলছেন? ও, নোটের খাতা। তা সেজন্যে আপনি ভাববেন না। আপনার জন্যে বিশেষ করে আমি আর এক কপি তৈরী করে রেখেছি, আজই সন্ধ্যাবেলা আপনার বাড়ীতে পৌছে দেব।'

সুষমা কৃতজ্ঞস্বরে বলিল,—'ধন্যবাদ ভূপেনবাবু। তারপর কুণ্ঠিত-ভাবে সমরেশের দিকে তাকাইয়া বলিল,—'কিন্তু সমরেশবাবু—'

ভূপেন বাধা দিয়া বলিল,—'ওঁর ভালই হ'ল। নিজের কপিটা

আপনাকে দিলে ওঁর পড়াশুনোর হয়ত ব্যাঘাত হ'ত।—চলুন আপনার ট্যাক্সি ডেকে দিই।'

সেদিন বাসায় ফিরিয়া সমরেশ দেখিল তাহার বাবার নিকট হইতে এক পত্র আসিয়াছে। অন্যান্য কথার পর তিনি লিখিয়াছেন,—

'তোমার মা তোমার বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমি তোমার মত ও রুচির বিরুদ্ধে কিছু করিতে চাই না। তুমি নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ কর ইহাই আমার ইচ্ছা। নিজের ও আমাদের সুখ সুবিধা বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার বয়স ও বুদ্ধি তোমার হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে তোমার মতামত জানাইবে।'

সমরেশ চিঠি পড়িয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিতে বসিল ; লিখিল,—'বাবা, কোনো ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করিবার উপযুক্ত সামাজিক শিষ্টতা ও ভদ্রতা আমি এখনো শিখি নাই। যদি কখনো শিখি আপনাকে জানাইব।'

এই লিখিয়া তিক্ত অন্তঃকরণে পোষ্টকার্ডখানা নিজের হাতে ডাকে দিয়া আসিল।

ইহার পর আরো কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। এই মাস কয়েকের মধ্যে অনেকবার সুষমা সমরেশের সহিত কথা কহিয়াছে, সমরেশও কতকটা বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণীর মত তাহার জবাব দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু অন্তর হইতে সঙ্কুচিত জড়তা কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছে না। সুষমার কথাগুলির মধ্যে তাহার প্রতি যে একটি নম্র শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় তাহা সে বুঝিতে পারে—বেশ উৎসাহিত হয়। কিন্তু কোথা হইতে দুরপনেয় কুণ্ঠা আসিয়া তাহার স্বচ্ছন্দ মেলামেশার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। নিজের আচরণ প্রতি পদে পরীক্ষা করিতে করিতে আচরণটা প্রতি পদেই আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠে।

যখন একলা থাকে তখন নিজেকে শত ধিক্কার দিয়া ভাবে, সুষমা তাহার অসভ্যের মত আচরণ দেখিয়া নিশ্চয় মনে মনে হাসে ও উপেক্ষা করে। হয়ত তাহাকে আরো হাস্যাস্পদ করিবার জন্যই অনেক সময় নিজে উপযাচিকা হইয়া কথা কহিতে আসে।

কিন্তু একথাটা সে কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারে না যে তাহার লাজুক ও রমণী-ভীরু স্বভাবের বর্ম্ম ভেদ করিয়া কেহ তাহার নিভৃত অন্তরের সন্ধান পাইতে পারে। যাহা বাহিরে প্রকাশ তাহাই ত লোকে দেখিবে—মনের খোঁজ পাইবার অন্য পথই বা কোথায়?

সেদিন ক্লাশ শেষ হইবার পর সমরেশ বাড়ী যাইতেছে এমন সময় কলেজের চাপ্‌রাশি আসিয়া জানাইল যে প্রফেসার সরকার তাহাকে সেলাম দিয়াছেন। প্রবীণ প্রফেসারের জন্য একটি আলাদা ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল, সমরেশ পর্দ্দা সরাইয়া সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিল প্রফেসারের নিকট ভূপেন ও সুষমা উপস্থিত রহিয়াছে। অজানা আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিল।

মেধাবী ছাত্র ও সংযত আত্মসমাহিত প্রকৃতির লোক বলিয়া সমরেশকে প্রফেসার সরকার মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া একখানা চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—'বসো সমরেশ।'

সমরেশ বসিল। প্রফেসার সরকার বলিলেন,—'কাল আমার জন্মতিথি। একসঙ্গে বসে একটু আহারাদির বন্দোবস্ত করা গেছে। নিজের জন্মতিথিতে উৎসব করা আমার ভাল লাগে না, কিন্তু সুষমা শোনে না—প্রতি বৎসর করতে হয়। এখন ওটা একটা অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাহোক, তুমি আর ভূপেন কাল রাত্রে আমার বাড়ীতেই আহারাদি করবে, নিমন্ত্রণ রইল।'

সুষমা হাসিয়া বলিল,—'মামা, ঐ রকম করে বুঝি নেমন্তন্ন করে?

বলতে হয়, মহাশয়, কল্য রাত্রে মদীয় রসা রোডস্থ ভবনে আগমন পূর্ব্বক—তারপর কি বলতে হয় সমরেশবাবু ?'

সমরেশ একটা ঢোক গিলিয়া ক্ষীণ হাস্যে বলিল,—'শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করাইবেন ; পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, নিবেদন ইতি।'

সুষমা কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। কথাটা বলিয়া সমরেশও একটু খুশী হইয়াছিল, হাসি শুনিয়া তাহার সারা গা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সুষমাকে এমন ভাবে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে সে আর কখনো শুনে নাই।

প্রফেসার সরকারও হাসিয়া বলিলেন,—'ঐ হ'ল। সকাল সকাল এসো কিন্তু। আরো অনেকেই আসবেন। সুষমা সকাল থেকেই হাজির থাকবে, ও-ই বলতে গেলে তোমাদের হোষ্টেস্। ওর মামী ত শরীর নিয়ে কোনো কাজই করতে পারেন না।'

সমরেশ উঠিয়া—'যে আজ্ঞে'—বলিয়া বিদায় লইবার উপক্রম করিল।

ভূপেন বলিল,—'আমি এইমাত্র প্রফেসার সরকারকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছিলুম—তাঁর জীবনে এই দিনটি যেন বারবার ফিরে আসে।'

মুহূর্ত্ত মধ্যে সমরেশের মুখ মলিন হইয়া গেল। অভিনন্দন তাহারো জানানো উচিত ছিল, এবং সে নিশ্চয় জানাইত—এতটা নিরেট নির্ব্বোধ সে নয়। কিন্তু সুষমা উপস্থিত থাকায় তাহার মধ্যে সব ওলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছিল। সে কোনমতে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—'আমিও—আমিও আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি'—বলিয়া একরকম ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

অতঃপর প্রফেসার সরকারের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা। এইখানেই সমরেশের চরম দুর্গতি হইয়া গেল।

তাই সেখান হইতে ফিরিবার পথে ক্লান্ত দেহ ও উদ্‌ভ্রান্ত মন লইয়া সে ভাবিতেছিল, ভদ্রোচিত কোনো ব্যবহারই যখন তাহার দ্বারা সম্ভব নয় তখন মনুষ্য সমাজে বাঁচিয়া থাকিয়াই বা লাভ কি ?

এরূপ মর্ম্মান্তিক ভাবনার যথার্থ কারণ ঘটিয়াছিল কিনা তাহা নিমন্ত্রণ ব্যাপারের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

সন্ধ্যা সাতটার পর প্রফেসার সরকারের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সমরেশ দেখিল ড্রয়িংরুমে প্রায় পনের-ষোলো জন পুরুষ ও মহিলা সমবেত হইয়াছেন। সমরেশ একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল,—চেনা লোকের মধ্যে কেবল ভূপেন ও প্রফেসার বড়ুয়াকে দেখিতে পাইল। বিখ্যাত আচার্য্য বড়ুয়াকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই চিনিত ; এতবড় বিদ্বান সুরসিক ও অমায়িক প্রফেসার সচরাচর দেখা যায় না ! তাঁহার হাস্যবিম্বিত মুখ হইতে জ্ঞান কৌতুক দাক্ষিণ্য ও মদের গন্ধ প্রায় সর্ব্বদাই ক্ষরিত হইতে থাকিত। ছাত্রমহলে এমন অব্যাহত প্রসার বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোনো আচার্য্যই লাভ করিতে পারেন নাই।

সমরেশ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সুষমা আসিয়া ঈষদরুণ সহাস্যমুখে তাহার অভ্যর্থনা করিল,—'আসুন সমরেশবাবু। এত দেরী করলেন যে ?'

অতিথিকে লৌকিক আপ্যায়িত ছাড়াও সুষমার কণ্ঠে যে একটি স্বকীয় আনন্দ-আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল তাহা সমরেশের কানে পৌঁছিল না ; অপরাধ করিয়া করিয়া সে এতই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে যে অপ্রস্তুত ভাবে বলিল,—'বড্ড দেরী হয়ে গেছে—না ? ভারি অন্যায় করেছি।'

সুষমা বলিল,—'নিশ্চয় অন্যায় করেছেন কিন্তু সেজন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না, লোকসান আমাদেরি। আর একটু আগে এলে বাবার সঙ্গে দেখা হত। তিনি এইমাত্র চলে গেলেন।'

সমরেশ অনুতপ্ত বিমর্ষ মুখে চুপ করিয়া রহিল; সুষমা বলিল,—'ডাক্তার হ'বার ঐ মুস্কিল। দেখুন না কোথায় মামার জন্মতিথিতে একটু আমোদ আহ্লাদ করবেন তা নয় কোথাকার কোন রুগী ফোন করে ধরে নিয়ে গেল।'

সমরেশের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনার বাবা বুঝি ডাক্তার?'

—'হ্যাঁ। কেন বলুন ত?'

সমরেশ তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, বলিল,—'না—অমনি—আমার বাবাও ডাক্তার।'

উৎফুল্লনেত্রে চাহিয়া সুষমা বলিয়া উঠিল,—'তাই নাকি! আপনি তাহলে আমার ব্যথার ব্যথী বলুন।' বলিয়াই সুষমা লজ্জিত হইয়া পড়িল, কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি বলিল,—'চলুন, মামীর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

প্রফেসার-পত্নী অদূরে একটি কৌচে বসিয়া ছিলেন, সমরেশকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া সুষমা বলিল,—'মামী, ইনি সমরেশবাবু, মামার শ্রেষ্ঠ ছাত্র।'

প্রফেসার-পত্নী মুখ তুলিয়া সাদরে বলিলেন,—'এস বাবা এস।'

তাঁহার রুগ্ন অথচ প্রীতিপ্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া সমরেশের সঙ্কোচের কুয়াশা অর্দ্ধেক কাটিয়া গেল, সে অবনত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার পাশে বসিয়া বলিল,—'আমি প্রফেসার সরকারের একজন ভক্ত ছাত্র। তাঁর জন্মতিথি উৎসবে যোগ দিতে পারা আমার পক্ষে যে কতবড় সৌভাগ্য তা বলতে পারি না। উনি দীর্ঘ জীবনলাভ করে এই দিনটিকে বারবার ফিরিয়ে আনুন এই আমাদের কামনা।'

এমন সহজ আন্তরিকতার সহিত সমরেশকে কথা কহিতে সুষমা পূর্ব্বে

কখনো শুনে নাই। তাহার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল, সে আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

ঘরের অন্যদিকে প্রফেসার বন্ধুরা নানাজাতীয় চুট্‌কি গল্পে আসর জমাইয়া তুলিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে হাসির ঢেউ বহিয়া যাইতেছিল। ভূপেন সেই দলে বসিয়া ছিল কিন্তু তাহার চক্ষু দু'টা সতর্কভাবে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

গল্প গুজবে দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল, সমরেশ এক মুহূর্তের জন্যও প্রফেসার পত্নীর সঙ্গ ছাড়িল না। নয়টা বাজিতেই ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে ডিনার প্রস্তুত। সকলেই উঠিয়া পড়িলেন।

'ডিনার' শুনিয়াই সমরেশ চমকাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল,—'ডিনার? টেবিলে বসে খাওয়া?'

প্রফেসার-পত্নী সমরেশের আতঙ্কের অন্যরূপ অর্থ বুঝিয়া বলিলেন,—'আমরা সাধারণতঃ টেবিলে বসে খাই না, পাত পেড়েই খাই। কিন্তু আজ অনেক অতিথি এসেছেন যাঁরা মাটিতে বসে খেতে পারেন না—তাই টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু রান্না সব বামুনে করেছে, তুমি কি—' বলিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

সমরেশ তাড়াতাড়ি বলিল,—'না না—তা নয়—কিন্তু—'

ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিবার সময় সুষমাকে তাহার মামী একবার তীক্ষ্ণচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন,—'বেশ ছেলেটী সমরেশ, ভারী মিষ্টি স্বভাব। আর কি চমৎকার কথা কয়, যেন কতকালের চেনা।—ওকে মাঝে মাঝে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসিস।'

সুষমা কোনো উত্তর দিল না, কেবল একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

টেবিলে খাইতে বসিয়া সমরেশের মনে হইল তাহার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে আর নাই। এতগুলা ছুরি কাঁটা লইয়া সে কি করিবে,

কোন্‌টাকে কি ভাবে ব্যবহার করিবে, এতগুলা ছোট বড় চাম্‌চেরই বা কি প্রয়োজন তাহা কিছুই ধারণা করিতে না পারিয়া সে একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল। তাহার একপাশে একটি তরুণী বসিয়াছিলেন, বোধ হয় সুষমাব বন্ধু, অন্য পাশে একটি সাহেব বেশধারী ভদ্রলোক। এই দুইজনের মধ্যস্থলে সমরেশ দারুময় জগন্নাথের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

'সুপ' চামচ দিয়া খাইতে হয়, তাহাব জন্য ছুরি কাঁটার দরকার নাই একথা অতি বড় নির্ব্বোধও বিনা উপদেশে বুঝিতে পারে। সুতরাং সে ফাঁড়াটা সহজেই কাটিয়া গেল। গোল বাধিল মৎস্যেব সঙ্গে।

খাওয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, কথোপকথনের একটা মৃদু গুঞ্জরনের মধ্যে সমরেশ নিজেকে অনেকটা নিরাপদ মনে করিতেছে, এমন সময় ভূপেনের সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে গুঞ্জনধ্বনি চাপা পড়িয়া গেল। ভূপেন টেবিলের অন্যদিকে ছিল, গলা বাড়াইয়া দেখিয়া মুখখানা বেশ গম্ভীর করিয়া বলিল,—'সমরেশ বাবু, একটু ভুল করেছেন। ছুরিটা ডানহাতে ধরতে হয় আর কাঁটা বাঁ হাতে।'

সমরেশের ভুলটা যে কেহই লক্ষ্য করে নাই এমন নয় কিন্তু এই খোঁচাটা এতই নিষ্ঠুর এবং অপ্রত্যাশিত যে সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। সমরেশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে মূঢ়ের মত দুই হাতে ছুরি কাঁটা ধরিয়া নিজের পাতের দিকে বিহ্বল চক্ষে চাহিয়া রহিল।

শিষ্ট সমাজে ক্বচিৎ এইরূপ দুর্ঘটনা যখন ঘটিয়া যায় তখন, কিছুই ঘটে নাই এমনি ভাণ করাই একমাত্র ভদ্ররীতি। উপস্থিত সকলে সেই রীতি অবলম্বন করিলেন, যেন শুনিতে পান নাই এমনিভাবে পুনর্ব্বার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। শুধু সুষমার দুইগাল রক্তবর্ণ হইয়া জ্বালা করিতে লাগিল, সে হাত গুটাইয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

কিন্তু দুর্নিয়তি তখনো সমরেশকে ত্যাগ করে নাই। আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আর একটা ব্যাপার ঘটিল। অসাবধানে হাত নাড়ার জন্যই বোধ হয়, একটা ঝোলের বাটি হঠাৎ সমরেশের সম্মুখ হইতে অদ্ভুত ভাবে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার কোলের উপর পড়িয়া গেল এবং তরল সস্নেহ ঝোলে তাহার পাঞ্জাবী ও চাদর অভিষিক্ত করিয়া দিল।

পৃথিবী, দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি—এই কামনা সীতাদেবীর পর হইতে বোধ করি অনেক নরনারীকেই সময়-অসময়ে করিতে হইয়াছে। সমরেশও কায়মনোবাক্যে সেই কামনাই করিয়াছিল এমন সময় টেবিলের অপর প্রান্তে ঝন্ ঝন্ শব্দে সকলে সচকিত হইয়া দেখিলেন, সুষমার চমৎকার কলাপাতা রঙের সিল্কের শাড়িটী অনুরূপ তরল সস্নেহ ঝোলে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে এবং সে অপ্রতিভভাবে মুখ নত করিয়া হাসিতেছে।

এই বৃহত্তর দুর্ঘটনায় সমরেশের দুষ্কৃতি চাপা পড়িয়া গেল বটে কিন্তু তাহার মনের অশান্তি দূর হইল না। উপরন্তু কোন্ এক প্রহেলিকার ইঙ্গিত অনুশোচনার সঙ্গে মিশিয়া তাহাকে আরো পীড়িত করিয়া তুলিল।

আহার শেষ হইলে প্রফেসার বড়ুয়া উঠিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা দিয়া সহকর্ম্মীকে অভিনন্দিত করিলেন। উপসংহারে বলিলেন,—'আপনারা পাত্র পূর্ণ করুন, প্রফেসার সরকারের স্বাস্থ্য পান করা চাই।'

প্রফেসার সরকার মৃদুস্বরে আপত্তি করায় বড়ুয়া সাহেব বলিলেন,—'না না, ও কোনো কাজের কথা নয়। কারণবারি না হলে কার্য্য সুসম্পন্ন হবে না। শ্যাম্পেন্ আনাও—শ্যাম্পেনে মহিলাদেরও আপত্তি হতে পারে না।'

প্রফেসার বড়ুয়ার জন্য শ্যাম্পেন আনানো ছিল, অগত্যা তাহাই উপস্থিত করা হইল। সকলের পাত্র পূর্ণ করা হইল। প্রফেসার বড়ুয়া নিজের পাত্রটি উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন,—'Long life to Professor Sarkar! Drink hearty!'

মহিলারা কেহই পান করিলেন না, শুধু পাত্র অধরে ঠেকাইয়া নামাইয়া রাখিলেন। ভূপেন একচুমুকে নিজের পাত্র শেষ করিয়া ফেলিল। সমরেশও একচুমুক খাইল বটে কিন্তু পাত্র শেষ করিতে পারিল না।

অতঃপর মহিলারা ড্রয়িং রুমে ফিরিয়া গেলেন, পুরুষেরাও ইচ্ছামত কেহ কেহ দু'একপাত্র টানিয়া একে একে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন।

ঝোল-বঞ্জিত কাপড়চোপড় লইয়া ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা সমরেশের ছিল না, সে অলক্ষিতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পলায়ন করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ওদিকে প্রফেসার বড়ুয়াকে কেন্দ্র করিয়া দ্রাক্ষারসের আস্বাদন ও নিম্নকণ্ঠে আলাপ চলিতেছিল, সমরেশের দিকে কাহারো লক্ষ্য ছিল না। এই ফাঁকে সে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় ভূপেন পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল,—"পাঞ্জাবী দিব্যি রঙিয়ে ফেলেছেন দেখছি। 'হোরি খেলত বহুয়ারী'?—তা এখানে বসে কেন? ড্রয়িং রুমে গেলেই ত পারেন, সেখানে মহিলারা আপনার পাঞ্জাবীর বর্ণবৈচিত্র্য দেখে নিশ্চয় খুব আনন্দ পাবেন।"—বলিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া নিম্নকণ্ঠে একটা গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রস্থান করিল।

অপরিসীম আত্মগ্লানির মধ্যেও ক্রোধের শিখা সমরেশের মাথার মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। ভূপেনের পৃষ্ঠের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া

মনের মধ্যে যে কথাগুলা বিষের মত ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল, ভাগ্যে সেগুলা মনের মধ্যেই রহিয়া গেল, এই স্থানে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িলে যে বিশ্রী ব্যাপার ঘটিত তাহার ফলে বোধ করি সমরেশকে আত্মহত্যা করিতে হইত।

মিনিট কয়েক পরে সমরেশ নিঃশব্দে উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় গিয়া দেখিল সেখানে কেহ নাই। সে চুপি চুপি বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ নজর পড়িল দূরে বারান্দার এক কোণে সুষমা ও ভূপেন দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। সুষমার আরক্ত মুখ ও তীব্র চোখের দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য সমরেশের চোখে পড়িল, সে হেঁটমুখে বারান্দা পার হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

সমরেশকে দেখিবামাত্র সুষমা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া বলিল,—'সমরেশবাবু আপনি যাচ্ছেন?'

সমরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'হ্যাঁ—রাত হয়েছে,—আমি যাই।'

সুষমা তাহার আরো কাছে আসিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিল,—'একটু দাঁড়াবেন না? আমিও তাহলে আপনার সঙ্গে যেতুম, আপনি আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে পারতেন। আপনার সঙ্গে না গেলে, এই রাত্রে আবার মামাকে যেতে হবে আমায় পৌঁছে দিতে।'

ভূপেনের বিষাক্ত শ্লেষ তখনো সমরেশের বুকের মধ্যে জ্বলিতেছিল, সুষমার কথাগুলা তাহার কাণে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মত শুনাইল, সে মাথা নাড়িয়া বলিল,—'না, মাফ করবেন—আমি আর থাকতে পারছিনে—'

সুষমা যেন আহত হইয়া ফিরিয়া আসিল; তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল, তবু সে আর একবার বলিল,—'মামীর সঙ্গে দেখা করে যাবেন

না? আমি না.হয় তাঁকে এইখানে ডেকে আনছি'—বলিতে বলিতে তাহার দৃষ্টি সমবেশের ঝোলমাথা পাঞ্জাবীটার উপর গিয়া পড়িল।

'না—নমস্কার!' সমরেশ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ফুটপাথ হইতে শুনিতে পাইল ভূপেন বলিতেছে—'আপনি চিন্তিত হচ্চেন কেন? আমি ত রয়েছি, আপনার মামা না যেতে পারেন—'

চৌরঙ্গী পার হইয়া সমবেশ ধর্ম্মতলাব বাস্তা ধবিল। হাঁটিতে হাঁটিতে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত আসিযা সে চমক ভাঙ্গিয়া দেখিল রাস্তায লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গিযাছে, শূন্যপথেব দুইধারে গ্যাসের বাতিগুলা যতদূর দেখা যায নির্নিমেষভাবে জ্বলিতেছে। দোকানপাট বন্ধ।

সমরেশ ভাবিল, দূব ছাই, আজ আব গাড়ী পাওযা যাবে না। গলি দিয়েই যাই।

বাসায় চাকরটা এখনো তাহার জন্য অপেক্ষা করিযা জাগিযা আছে স্মরণ করিয়া পার্কের ভিতর দিযা দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পাশে একখানা খালি বেঞ্চি তাহাব পবিশ্রান্ত দেহকে বেশীদূব অগ্রসর হইতে দিল না। মোটবাহী কুলি যেমন ঘাডেব মোট নামাইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করে, সেও তেমনি ভারাক্রান্ত দেহটাকে বেঞ্চির উপর নামাইয়া বসিয়া পড়িল।

মিনিট পনেব পরে কিন্তু আবার তাহাকে উঠিতে হইল। পার্কে বেঞ্চির উপর রাত কাটাইয়া কোনো লাভ নাই, বাসায় ফিরিয়া কোনক্রমে এই উচ্ছিষ্ট কাপড়চোপডগুলা ছাড়িযা শয্যা আশ্রয় কবিতে পারিলে সে বাঁচে। পায়ের আঙুল হইতে বগের শিরগুলা পর্য্যন্ত

অপরিসীম অবসাদে ভাঙিয়া পড়িতেছে; কিন্তু বাকী পথটা যে করিয়া হোক অতিক্রম করিতেই হইবে।

গলি দিয়া যাইতে যাইতে সম্মুখে কিছু দূরে সমরেশ দেখিল একখানা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার বাহিরে দাঁড়াইয়া একটা লোক হুডের ভিতর মাথা ঢুকাইয়া কাহার সহিত কথা কহিতেছে। আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া শুনিতে পাইল গাড়ীর ভিতরে বসিয়া যে কথা কহিতেছে সে স্ত্রীলোক। এই সব পাড়ায় নিজ্জন রাত্রে অনেক রকম ব্যাপার ঘটিয়া থাকে তাই সমরেশ তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। দণ্ডায়মান ট্যাক্সি ছাড়াইয়া দু'পা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় যে পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল তাহাতে সে তীরবিদ্ধের মত ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—'এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন ? আমি যে বাড়ী যাব।'

উত্তেজনা-বিকৃত কণ্ঠে পুরুষটা বলিল,—'রাস্তার মাঝখানে একটা সীন্ কোরো না সুষমা; কোনো ভয় নেই—এ আমার বাসা। একবারটি নামো, কেউ জানতে পারবে না। তারপর আমি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেব।'

—'না না, আগে আমায় বাড়ী পৌঁছে দিন।'

ভূপেন সুষমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল,—'নেমে এস, নেমে এস। এসব প্রুডারি কি তোমার মত এডুকেটেড গার্লের সাজে!' বলিয়া একটা বিশ্রী হাসি হাসিল।

এক লাফে সমরেশ ট্যাক্সির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল,—'কি হয়েছে ? সুষমা?'

সুষমা আর্ত্তস্বরে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল,—'সমরেশবাবু, আমাকে বাঁচান।'

ভূপেন বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া সম্মুখে সমরেশকে দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সমরেশও ভূপেনের মুখ দেখিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল—মানুষের মুখ এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা যেন কল্পনার অতীত। যে হিংস্র পশুটাকে ভূপেন এত দিন শিষ্টতার আড়ালে সযত্নে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, শিকার সান্নিধ্যে পাইয়া সেই পশু যেন মুখ বাহির করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সমরেশের বুকের মধ্যে বহুদিন সঞ্চিত বিদ্বেষ ও ঘৃণা একমুহূর্ত্তে ফাটিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইল ভূপেনের ঐ কদর্য্য পাশবিক মুখখানাকে লাথি মারিয়া ঘুঁষি মারিয়া ভাঙিয়া থেঁতো করিয়া একেবারে লুপ্ত করিয়া দেয়। সে এক বজ্রমুষ্টিতে ভূপেনের চুল ধরিয়া অন্য হাতে তাহার গালে একটা বিরাট চপেটাঘাত করিয়া বলিল,—'হতভাগা ছোটলোক জানোয়ার কোথাকার! ক্যাডাভ্যাবাস কুকুরের বাচ্চা। আজ তোকে খুন করব।'—বলিয়া আর একটি ততোধিক বিরাট চপেটাঘাত করিল।

ভূপেনও রুখিয়া উঠিয়া বলিল,—'খবরদার বলছি—'

সমরেশ সঙ্গে সঙ্গে তাহার পেটে এক প্রচণ্ড লাথি কষাইয়া বলিল,—'তবে রে—'

তারপর তাহার মুখ দিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের মত যে সমস্ত শব্দ বাহির হইল,—হিন্দি উর্দ্দু ইংরাজী বাংলা মিশ্রিত যে অনুষ্টুপ শ্লোক অবাধে অনর্গলভাবে নির্গত হইতে লাগিল তাহার পুনরুক্তি করিবার সাহস বা শক্তি আমাদের নাই। ভূপেন সেই বাক্যের আগুনে যেন একখণ্ড কাগজের মত পুড়িয়া কুঁকড়াইয়া গেল। গাড়ীর মধ্যে সুষমা দুই কানে সজোরে আঙুল পুরিয়া দিয়া, বিস্ফারিত চক্ষে অপূর্ব্ব আলোক ফুটাইয়া নিস্পন্দ বক্ষে বসিয়া রহিল।

প্রিয়তমা নারীর রক্ষার্থ পুরুষ যখন লড়াই করে, তখন প্রিয়তমার মনের ভাবটা কিরূপ হয় কে জানে ?

ভূপেনের নাকে অন্তিম একটা ঘুষি মারিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিয়া সমরেশ বলিল,—'যা শালা কেঁচোর বাচ্চা, নর্দ্দামায় শুয়ে থাকগে যা!' তার পর ট্যাক্সিতে সুষমার পাশে উঠিয়া বসিয়া চালককে বলিল,—'চালাও—হাতীবাগান।'

গাড়ী চলিল। দুইজনে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এই ভাবে মিনিট পাঁচেক কাটিয়া গেল।

শেষে সুষমা মৃদুস্বরে বলিল,—'কি বলে ঐ সব কথাগুলো মুখ দিয়ে বার করলেন ?'

সমরেশের শরীরে ক্লান্তির কণামাত্র আর অবশিষ্ট ছিল না, সে হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল,—'ঐ কথাগুলো মুখ দিয়ে বার করা এবং পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত ইত্যাদি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা মস্ত কথা বুঝতে পেরেছি যা এতদিন কিছুতেই বুঝতে পারছিলুম না। সেজন্যে দোষ অবশ্য সম্পূর্ণ তোমার, তুমিই আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছিলে।'

অন্ধকারের মধ্যে সুষমা হাসিল, বলিল,—'কি কথা বুঝতে পেরেছেন শুনি ?'

সমরেশ হাত বাড়াইয়া সুষমার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল,—'বুঝতে পেরেছি যে আমি একজন খাঁটি ভদ্রলোক। শুধু তাই নয়, আরো অনেক কথা বুঝতে পেরেছি যা চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে বলা যায় না।'

সুষমা সাড়া দিল না; সমরেশ তখন তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল,—'সুষমা, কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ীতে আমার চায়ের

নেমন্তন্ন রইল,—ঠিক পাঁচটার সময়—বুঝলে? আগে থাকতে খবর দিয়ে রাখলুম—তৈরী হয়ে থেকো।'

সুষমা চুপিচুপি বলিল,—'আমি ত আপনাকে নেমন্তন্ন করিনি—'

সমরেশ বলিল,—'ওঃ! তাও ত বটে! অনিমন্ত্রিত ভাবে যাওয়া ত কোনমতেই ভদ্রতা হবে না। তা, এক কাজ কর, সে ত্রুটি তুমি এখনি সংশোধন করে নাও। বল, মহাশয়, কল্য সায়াহ্নে বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় আপনি সবান্ধবে—না না সবান্ধবে নয়, সবান্ধবে নয়—একাকী! কি বল? সুষমা?'

সুষমা কিছুই বলিল না; কিন্তু তাহাদের দুজনের বাহু যেখানে আঙুলে আঙুলে জড়াইয়া নিবিড়ভাবে পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ করিতেছিল সেইখানে সমরেশ সামান্য একটু চাপ অনুভব করিল।

৩০ মাঘ ১৩৩৮

দৈবাৎ

পরিচয়

পরিতোষ বাবু—ভদ্রলোক, অবস্থাপন্ন, বিপত্নীক, নিঃসন্তান।

শৈলেন—যুবক, উচ্চশিক্ষিত, মাতৃপিতৃহীন, মাতুল পরিতোষ বাবু কর্ত্তৃক পুত্রবৎ পালিত।

উষা—শৈলেনের কনিষ্ঠা ভগিনী।

ফটিক—বালক ভৃত্য।

ভাগিনেয়—আগন্তুক।

সকলেই বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে আসিয়াছেন।

প্রথম দৃশ্য

জসিডি জংসন। দিঘড়িয়া পাহাড়ের প্রায় পাদমূলে। সন্ধ্যা হইয়াছে; বৃষ্টি হইতেছে, জোরে ঝড় বহিতেছে। কিছুই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। কেবল স্থানে স্থানে বৃষ্টির জল জমিয়া একটা মলিন শ্বেতাভার সৃষ্টি করিয়াছে।

উষা অতি সাবধানে পা ফেলিয়া পাহাড়ের দিক হইতে প্রবেশ করিল। তাহার গা ওয়াটার-প্রুফে ঢাকা, পায়ের শাদা চামড়ার জুতা জল ও কাদায় অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছে। উহাকে দেখিয়া মোটেই ভীত বা উৎকণ্ঠিত বোধ হইতেছে না। বরং সে যেন এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পথ হারাইয়া যাওয়ার ব্যাপারটাকে বেশ উপভোগ করিতেছে।

বিদ্যুৎ চমকিল এবং পরক্ষণেই বজ্রের একটা বিকট আর্ত্তনাদ উঠিল।

উষা হঠাৎ ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—'মামা—মামা—'

পাহাড়ের দিক হইতে সাহেব বেশধারী এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। পিচ্ছিল জমির উপর পা হড়্‌কাইয়া পড়িতে পড়িতে দু'বার সামলাইয়া লইল। কিন্তু তৃতীয়বার আর পারিল না—হঠাৎ চার হাত দূর পর্য্যন্ত পিছলাইয়া গিয়া কাদার মধ্যে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে তাহার মাথার টুপীটা দম্‌কা হাওয়ায় উড়িয়া ব্যোমপথে অদৃশ্য হইল।

উষা অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করিতে না পারিয়া ছুটিয়া কাছে আসিয়া ডাকিল,—'মামা—'

সে ব্যক্তি উঠিয়া বসিল। নাসিকার অগ্রভাগ হইতে কর্দ্দম মুছিয়া ঝাড়িয়া ফেলিল। তারপর বলিল,—'আমি মামা নই—আমি ভাগ্নে।'

উষা অবাক হইয়া গেল।

উষা। ভাগ্নে ?

ব্যক্তি। হ্যাঁ—ভাগ্নে। কিন্তু মামা আমার সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার করেননি। আমাকে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ফেলে তাঁর অস্ত যাওয়া মোটেই উচিত হয়নি।

উষা। আপনার মামা কে ?

সে ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যক্তি। আমার মামা—সূয্যি মামা।

কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া উষা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উষা। সূয্যি মামা—(হাসি)

সূয্যি মামার ভাগ্নে ঘাড় বাঁকাইয়া বীরদর্পে দাঁড়াইল; চক্ষু পাকাইয়া বলিল,—'হাসি! এই ঝড় বৃষ্টির সময় হাসি! আমি পা পিছলে কাদার মধ্যে হেঁডেডুডু খেলছি আর হাসি!' (পদদাপ)

পদদাপ করিতে গিয়া আবার পদস্খলন ও চিৎ হইয়া পতন। উষার উচ্চ হাস্য। সে ব্যক্তি শয়ান অবস্থাতেই হস্তভঙ্গী করিয়া ক্রুদ্ধভাবে কহিল,—'ফের হাসি! আমি পড়ে গেছি তাই—তুম্ কোন্ হ্যায়? কে তুমি? তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি বাঙালী কি বেহারী কি মারাঠী কি গুজরাটী কি উড়ে—

উষা। আমি বাঙালী।

সে ব্যক্তি অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিল।

ব্যক্তি। বাঙালী? ঠিক! বেহারী কিম্বা উড়ে হলে 'মামা' না বলে 'মামু' বলত।—কিন্তু তোমার অত হাসি কিসের? তুমি কি জাতি?

উষা। আমি স্ত্রীজাতি।

সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যক্তি। স্ত্রীজাতি? আপনি বাঙালী স্ত্রীজাতি! (টুপী তুলিবার জন্য মাথায় হাত দিয়া) আমার টুপী কোথায়?

উষা। আমি তাকে উড়ে যেতে দেখেছি।

সহসা সে ব্যক্তি ভীষণ চটিয়া উঠিল।

ব্যক্তি। কি! আমার টুপী উড়ে যেতে দেখেছ? (আত্মসম্বরণ করিয়া) ওঃ আপনি বাঙালী স্ত্রীজাতি। তা—ইয়ে হয়েছে—আপনি এখানে কি মনে করে?

উষা। আমি আর আমার মামা পাহাড়ে বেড়াতে এসেছিলুম। তারপর এই দুর্য্যোগে মামাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না।

ব্যক্তি। আপনার মামা—ইয়ে—তাঁকে আর খুঁজে পাবেন না।

উষা। অ্যাঁ! সে কি!

ব্যক্তি। দিঘরিয়া পাহাড়ে ভয়ানক বাঘ—আপনার মামা বোধ হয় তাদের সঙ্গেই রাত্রি যাপন করবেন।

উষা। [ব্যাকুলভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া] অ্যাঁ—না না—মামা মামা—

ব্যক্তি। [নিজমনে] হাসি! হাসি! আমি কাদায় আছ্‌ড়া পিছ্‌ড়ি খাচ্চি আর হাসি! [উষার নিরুপায় ভাব লক্ষ্য করিয়া] না—এটা উচিত হচ্চে না—নেহাৎ বর্ব্বরতা হচ্ছে।—[প্রকাশ্যে] ইয়ে—তা কোনো ভয় নেই। বাঘেরা আপনার মামার সন্ধান নাও পেতে পাবে।

উষা নীরব মিনতির চক্ষে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

ব্যক্তি। দেখছেন না এই পেছলে বাঘ কখনো বেরুতে পারে? আর যদি বা বেরোয় আর কোথাও যেতে পারবে না সড়াৎ করে এইখানে এসে হাজির হবে।

উষা। কিন্তু কৈ এসে হাজির হচ্ছে না ত।

ব্যক্তি। তার মানে তারা বেরোয়নি। আমাদের চেয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বেশী।

উষা। কিন্তু মামা—

ব্যক্তি। তিনিও নিশ্চয় বেরোননি নিরাপদেই আছেন। অথবা হয়ত আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে গেছেন।

উষা। ষ্টেশন কোন্ দিকে?

ব্যক্তি। সেটা দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের অভাবে বলা শক্ত। খুঁজে নিতে হবে।

উষা। তাহলে—

ব্যক্তি। হ্যাঁ—দিঘড়িয়া পাহাড়কে পেছনে রেখে যেদিকে হোক এগোনই ভাল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজলে নিউমোনিয়া হতে পারে, হাঁটলে সে ভয় কম।

সে ব্যক্তি অগ্রসর হইল। একাকিনী দাঁড়াইয়া থাকা অপেক্ষা ইহার সঙ্গে যাওয়া শ্রেয় বিবেচনা করিয়া উষা তাহার অনুসরণ করিল।

ব্যক্তি। [যাইতে যাইতে সহসা থামিয়া] মাফ কর্‌বেন—[ইতস্ততঃ] ওর নাম কি—

ঊষা। আমার নাম ঊষারাণী দত্ত।

ব্যক্তি। না না সে কথা নয়। আপনি কি জংসনেই থাকেন?

ঊষা। না। দেওঘরে বম্পাস টাউনে। আপনি?

ব্যক্তি। আমিও।

ঊষা। [সাগ্রহে] বম্পাস টাউনে!

ব্যক্তি। হুঁ।

ঊষা। আপনার নাম—?

ব্যক্তি। আমার নাম [মাথা চুলকাইয়া] শ্রীভাগিনেয় বসু।

এই বলিয়া বড় বড় পা ফেলিয়া প্রস্থান। ঊষার অনুগমন—উভয়ে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

পাহাড়ের দিক হইতে সাহেব বেশধারী আর একজনের প্রবেশ। প্যাণ্টালুন কর্দ্দমাক্ত, মাথার টাকের উপর হইতে বৃষ্টির জল চারিদিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। ইনি ঊষার মামা পরিতোষ বাবু।

পরি। ঘোড়ার ডিম! ভারী পেছল। [পা পিছলাইয়া] উঃ ঘোড়ার ডিম—গিয়েছিলুম আর একটু হলে। ঊষা—ঊষা! [হতাশ-ভাবে] ঘোড়ার ডিম! [দাঁড়াইয়া টাক হইতে জল মুছিলেন] কোথায় গেল মেয়েটা! কেন তাকে একলা ছেড়ে দিলুম! ঘোড়ার—[উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন] ঐ যে কে 'মামা' 'মামা' করে ডাকছে! কিন্তু ওত ঊষার গলা নয়। ঘোড়ার ডিম—আরও মামা এখানে আছে নাকি!

দূর হইতে শব্দ হইল—'মামা'—'মামা'—।

পরি। ঐ যে ঊষার গলা! ঊষা—ঊষা! কিছু দেখ্‌বার যো নেই। ঘোড়ার ডি—[বিদ্যুৎ চমকিল]

পরি। ঐ যে সামনে কিছু দূরে তুজন লোক দেখলুম না! একজন ওয়াটার-প্রুফ পরা, উষা বলেই বোধ হল। ঘোড়ার ডিম—বিদ্যুৎ আর একবার চম্‌কালে হত যে। একে পেছল তায় অন্ধকার, ঘোড়ার ডিম—

(নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেওঘর। বম্পাস টাউনে একটি সুদৃশ্য কুটির। নাম—প্রেম কুটির। তাহার পাঁচিল-ঘেরা বাগানের মধ্যে বাঁধানো চাতালের উপর টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সজ্জিত। সূর্য্য এই মাত্র অস্ত গিয়াছে—আকাশে বৃষ্টির কোনও লক্ষণ নাই। হাওয়া ঝরঝরে।

পরিতোষ বাবু একটি বেতের মোড়ায় বসিয়া একটি চুরোটের অতি ক্ষুদ্র শেষাংশ চুষিতেছিলেন। পরিধানে কোঁচানো ধুতি ও পিরান কিন্তু গলায় উলের গলাবন্ধ, পায়ে মোজা এবং চটিজুতা।

পরিতোষ বাবুর মোড়ার পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার বালক ভৃত্য ফটিক নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে।

সে কিছু হৃষ্টপুষ্ট—গাল তুটি উঁচু হইয়া নাসিকার বিশেষ খর্ব্বতা সাধন করিয়াছে। কপাল নাই বলিলেই হয়। বর্ণ নিকষকৃষ্ণ।

অন্য কেদারায় বসিয়া একটি যুবক,—সান্ধ্য ভ্রমণের উপযুক্ত সাজ—চেহারা সুশ্রী ও গম্ভীর কিন্তু অধরোষ্ঠ ঈষৎ চপলতার পরিচায়ক। সে নিবিষ্টমনে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। সে উষার দাদা শৈলেন।

বাড়ীর ভিতর হইতে বাদ্য সংযোগে সঙ্গীতের আওয়াজ আসিতেছিল। উষা গাহিতেছিল,—

‘আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ’

পরিতোষ বাবু চুরোটের দগ্ধাবশেষ হইতে আর কিছুমাত্র ধূম বাহির

করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া সেটা ফেলিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন,—'আজকের খবর পড়লে!'

শৈলেন। (কাগজখানা মুড়িয়া রাখিয়া) হ্যাঁ।

পরি। জাপানের ব্যাপারখানা দেখেছ?

শৈলেন। (একটু হাসিয়া) হ্যাঁ।

পরি। এমন ফন্দিবাজ জাত আর পৃথিবীতে নেই—ঘোড়ার ডিম—ওরা ভয়ানক ধূর্ত্ত। এই যে জাহাজের পর জাহাজ তৈরী করছে সে কি মিছিমিছি? ঘোড়ার ডিম—মোটেই নয়। ভারতবর্ষ যদি না জাপানীরা আক্রমণ করে ত বোলো তখন। ওই যে সব জাপানী ফিরিওয়ালা বস্তা ঘাড়ে করে দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা কি সাধারণ লোক মনে করেছ? ওরা সব ঘোড়ার ডিম—স্পাই স্পাই—দেশের প্ল্যান করে বেড়াচ্ছে, সুবিধে পেলেই আক্রমণ করবে।

শৈলেন। তা যদি করে আমাদের বেশ সুবিধে আছে—ওদের বস্তাগুলো কেড়ে নিলেই হবে।

পরি। তারা কি ঘোড়ার ডিম—বস্তা নিয়ে লড়াই করতে আসবে? সঙ্গীন উঁচিয়ে—কামান দাগতে দাগতে এসে হাজির হবে।

'ওঃ' বলিয়া শৈলেন এমনভাবে স্তব্ধ হইয়া রহিল যেন এ সম্ভাবনা সে কল্পনাই করে নাই।

উষার প্রবেশ।

উষা। কৈ, মিঃ বোস এখনো এলেন না?

পরি। ফটিক! ফটিক! ঘোড়ার ডিম—ঘুমিয়ে পড়েছে। (উচ্চ কণ্ঠে) ফটিক!

জাগরণের চিহ্ন স্বরূপ ফটিক প্রথমে বাম চক্ষু পরে দক্ষিণ চক্ষু সাবধানে উন্মীলন করিল এবং পরক্ষণেই কাঁদিয়া ফেলিল।

পরি। গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াগে যা। একটি বাবু আসবেন, এইখানে নিয়ে আস্‌বি।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে ফটিকের প্রস্থান

উষা অন্যমনস্কভাবে আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; একটা স্ফুটনোন্মুখ গোলাপের কুঁড়ি ছিঁড়িয়া একবার তাহাকে আঘ্রাণ করিয়া চুলের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিল। শৈলেন আড়চোখে তাহাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিযা খুব গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিল,—'উষা, কালকের ঘটনাটা কবিতায় লিখে ফেল—তারপর সেটা 'মন্দাকিনী'তে পাঠিয়ে দিলেই হবে। একে তোমার লেখা, তার ওপব নায়কের নামটি যে রকম চিত্তাকর্ষক—

উষা দাদাকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রূকুটি করিল। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

পরি। কেন শৈলেন তুমি ওকে ক্ষেপাও? ওর বাস্তবিক লেখবার ক্ষমতা আছে—তুমি ঘোড়ার ডিম—তাব বুঝবে কি? তুমি ওর 'অস্ফুট' পড়ে যতই হাসো না কেন, তার মধ্যে বাস্তবিক ভাল কবিতা আছে। এই ধর না কেন 'প্রার্থনা', 'আশ্রয় যাচঞা'—এগুলো ঘোড়ার ডিম উৎকৃষ্ট রচনা। ওইটুকু মেয়ের হাত থেকে অমন লেখা বেরোন কি যে-সে কথা। তুমি হাজাব চেষ্টা করলেও অমন একটা পদ্য লিখতে পারবে না।

শৈলেন। 'মন্দাকিনী'তে তার যে রকম প্রশংসা বেরিয়েছিল তাতে সে রকম লেখিকার উচ্চাশা আমাব বড় একটা—

উষা আসিযা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। ছেলেবেলার প্রথম লেখা ছাপানোর লজ্জাকর অধ্যায়টা এমনই উষাকে ত্রস্ত-সঙ্কুচিত করিয়া রাখিত,—তার উপর শৈলেন যখন সেই কথা লইয়া তাহাকে বিঁধিতেও

ছাড়িত না তখন তাহার দাদার প্রতি রাগ ও নিজের বিগত নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকিত না। এক এক সময় শৈলেনের জ্বালায় সত্য সত্যই তাহার লোক-সমাজে মুখ দেখানো ভার হইয়া উঠিত।

উষার বয়স এখন উনিশ; তাই সে পনেরো বছর বয়সে লেখা নিজের কবিতার মধ্যে অক্ষমতা ও ছেলে-মানুষী ভিন্ন আর কিছুই খুঁজিয়া পায় না, এবং লজ্জায় মরিয়া গিয়া ভাবে—কেন মরিতে এগুলাকে ছাপিতে গিয়াছিলাম।

ভাগিনেয় বোসের প্রবেশ ও সকলের অভিবাদন।

পরিতোষ বাবু মোড়া ছাড়িবার উদ্যোগ করিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। শৈলেন আগন্তুককে কিছুক্ষণ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। উষা পূর্ব্ব-দিনের সেই কাদা-মাখা অদ্ভুত জীবটির পরিবর্ত্তে এই সুবেশ সুশ্রী অতিথিটিকে দেখিয়া সহসা সম্ভাষণ করিবার মত উপযুক্ত কথা খুঁজিয়া পাইল না এবং মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

ভাগিনেয়। আপনাদের গেটের কাছে একটি বালক দেখলাম যার প্রকৃতি কিছু অস্বাভাবিক বলে বোধ হল। আমাকে দেখেই সে কেঁদে ফেল্‌লে; তাই দেখে আমার মনে দয়া হল, আমি তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। পরক্ষণেই দেখি সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরি। ওটি আমার বেয়ারা ফটিক!

ভাগি। ভারি আশ্চর্য্য! বাস্তব জগতে ফ্যাট বয় এবং যব ট্রাটারের এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ বোধ হয় আর কোথাও নেই। ওকে যাদুঘরে পাঠিয়ে দিন।—(উষার দিকে ফিরিয়া) কাল আপনার সঙ্গে

আমি সদ্‌ব্যবহার করিনি। সে জন্যে মাফ চাইছি। মনুষ্য সমাজে যে ব্যবহার একেবারে অমার্জ্জনীয়, দিঘড়িয়া পাহাড়ের ধারে হয়ত ততদূর নাও হ'তে পারে এই মনে করে এই দুষ্প্রাপ্য জিনিষ চাইতে সাহস কর্চ্ছি।

উষা। (সুস্মিত মৃদুস্বরে) সাহসের বলে মানুষ অনেক জিনিষ লাভ করে—আপনিও করলেন।

ভাগি। আমাকে বেশী সাহসী মনে করবেন না। প্রথমতঃ আমি বাঙালী, সুতরাং বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মতে আমার ভীরু হওয়া একটা জাতীয় কর্ত্তব্য, দ্বিতীয়তঃ—

শৈলেন। কিন্তু আপনার নামটি অসমসাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছে।

ভাগি। কি ভাবে?

শৈলেন। নামকরণ সম্বন্ধে সামাজিক বিধিবাঁধনগুলোর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ভাগি। (কিয়ৎকাল ভাবিয়া) দেখুন—আমার নামটা একটা মহামুহূর্ত্তের প্রেরণার ফল। ওটির জন্য আমাকে ঈর্ষা করবেন না।

উষা। আচ্ছা ভাগিনেয় বাবু, এ নামটি আপনার কে রেখেছিল?

ভাগি। আমি স্বয়ং। ছেলেবেলা থেকেই মামাদের প্রতি আমার একটু পক্ষপাত আছে।

শৈলেন। তাই নিঃসংশয়ে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের ভাগ্নে হযে বসে আছেন। কিন্তু এতে কোনও লোকের কিছু অসুবিধা হওয়া সম্ভব।

ভাগি। কি করে?

শৈলেন। (ইতস্ততঃ করিয়া) আপনার মহিলা বন্ধুরা সকলে এ সম্বন্ধে স্বীকার করতে রাজি না হতে পারেন।

ভাগি। আমার জানিত একটি লোক আছেন—তাঁর নাম

প্রাণেশ্বর! তাঁর বান্ধবীরা তাঁকে প্রাণেশ্বর বলে ডাকতে দ্বিধা করেন না।

সকলে স্তব্ধ। পরিতোষ বাবু অভিভূত। শৈলেন পরাজিত, উষা লজ্জাহত।

সন্ধ্যা হইয়াছিল। পরিতোষ বাবু দু'একবার কাশি চাপিবার চেষ্টা করিয়া শেষে বলিলেন,—'ঘোড়ার ডিম—কাল জলে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। আর বাইরে থাকা ঠিক নয়। উষা, তোমারও ত—'

উষা। না মামা, আমার কিছু হয়নি। তুমি বরং ভেতরে যাও আমরা আর একটু পরে—

পরি। আচ্ছা। ভাগিনেয় বাবুকে ছেড়ে দিও না। আমি তোমাদের জন্যে ড্রইং রুমে অপেক্ষা করব। উষা, একবারটি শুনে যাও।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

শৈলেন। [উত্তেজিত ভাবে] বিজন, তুমি—?

ভাগি। চুপ—ব্যাস। আমি ভাগিনেয়। সব মাটি করে দিও না। পরিতোষ বাবু তোমার—?

শৈলেন। মামা।

ভাগি। মেয়েটি ?

শৈলেন। বোন।

ভাগি। [উৎকণ্ঠিত] "অস্ফুট"র—?

শৈলেন। লেখিকা।

ভাগি [মাথায় হাত দিয়া] উঃ—চুপ !

(উষার প্রবেশ)

উষা। মামা বল্লেন আজ আমাদের সঙ্গে ডিনার খেয়ে তবে বাড়ী

যেতে পাবেন। কিন্তু ডিনারের এখনো ঢের দেরী আছে। ততক্ষণ না হয় এখানে বসে—

শৈলেন। কাব্য আলোচনা করা যাক। কি বলেন ভাগিনেয়বাবু? আপনি বোধ হয় জানেন না, আমার ভগিনী খুব একজন উঁচুদরের—

উষা। আঃ দাদা—চুপ কর।

শৈলেন। কবি। বাঙলা ভাষার সঙ্গে যদি আপনার পরিচয় থাকে, এমন কি মুখ দেখাদেখিও থাকে তাহলে নিশ্চয় আপনি 'অস্ফুট' নামক অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থের নাম শুনেছেন। তার মধ্যে 'প্রার্থনা', 'আশ্রয় যাচ্ঞা' প্রভৃতি যে সব উচ্চ অঙ্গের কবিতা আছে তা পড়লে চোখের জল সজোরে বেরিয়ে পড়ে। আপনি বল্‌বেন ভগিনীর কাব্য সম্বন্ধে ভ্রাতার মনে একটু দুর্ব্বলতা থাকা সম্ভব। প্রত্যুত্তরে আমিও বলতে পারি যে ফটিক উষার ভাই নয় তথাপি সেও কেঁদে ফেলেছিল।

উষা। দাদা তুমি—

শৈলেন। আমি কিছুমাত্র অত্যুক্তি করছি না। দরকার হয় আমি এখনি ফটিকের ঘুম ভাঙিয়ে তার সামনে তোমার একটা কবিতা আবৃত্তি করে একথা প্রমাণ করে দিতে পারি। তাছাড়া 'মন্দাকিনী'র সম্পাদক বিজন বোস এই কাব্যখানির যে মর্ম্মস্পর্শী সমালোচনা করেছিলেন—

উষা। তবে যাও—[প্রস্থানোদ্যতা]

ভাগি। ওর নাম কি—যাবেন না। দশানন সীতাহরণ করেছিল সেই অপরাধে সাগরের বন্ধন হল। আপনার দাদার ধৃষ্টতার জন্যে আপনি আমাকে শাস্তি দিয়ে চলে যাচ্ছেন কেন?

উষা। [ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া] বেশ, যত ইচ্ছে বলে যাও। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।

ভাগি। এই ত চাই। সমালোচনা গায়ে মাখতে নেই; সমালোচককে জব্দ করবার ঐ একমাত্র উপায়।—আমার যখন বয়স অত্যন্ত কম তখন একবার নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে একটা আস্ত ডিম খোলাসুদ্ধ কচমচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিলাম। তার পর থেকে আমার সামনে ডিমের নাম উচ্চারণ করলেই আমার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করত এবং নিজের মাথাটা দেয়ালে ঠুকতে ইচ্ছে করত। কিন্তু এখন দেখুন, আমার চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ মুর্গী এবং হাঁস অনবরত ডিম পাড়তে থাকলেও আমি অবিচলিত হয়ে তা দেখতে পারি। আমার মনে কোনও বিকার উপস্থিত হয় না।

শৈলেন। আচ্ছা উষা, বিজন বোসের সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয় তাহলে তুমি কি কর?

উষা কুঞ্চিতভ্রূ নীরব।

ভাগি। একথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে সে ব্যক্তি যত বড় দুর্ব্বৃত্তই হোক না কেন উনি তাকে ক্ষমা করবেন।

উষা। কখ্খনো না—কখ্খনো না। আমি আপনাকে বলছি ভাগিনেয়বাবু, দাদা যদি রাতদিন এই কথা নিয়ে আমাকে জ্বালাতন না করতেন তাহলে হয়ত আমি এই বিজন বাবুকে ক্ষমা করতে পারতুম। কিন্তু—শুনেছি বিজন বাবু দাদার বন্ধু—এঁরা দুজনে মিলে আমাকে পাগল করে দেবেন।

উষা রোদনোন্মুখী

ভাগি। [উষার পাশে চেয়ার টানিয়া লইয়া] আপনার দাদা যখন সেই নরাধমের বন্ধু তখন আপনার দাদার সম্বন্ধেও আমার ধারণা বদলে গেল। বুঝলাম, উনিও একজন পাষণ্ড। কিন্তু পাপী এবং পাষণ্ডদের

ক্ষমা করাই হচ্ছে ধর্ম্ম। ভেবে দেখুন, ইংরেজদের যীশুখৃষ্ট পর্য্যন্ত ঐ কথা বলে গেছেন।

উষা। যীশুর উপদেশ ইংরেজরা যেমন মানে আমিও তেমনি মানব।

ভাগি। সেটা কি ভাল দেখাবে? আপনি একজন খাঁটি আর্য্যনারী, নিমাই নিতাই শুক সনকের দেশে আপনার জন্ম। আপনিও যদি কতকগুলো অস্পৃশ্য কদাকার ইংরেজের দেখাদেখি যীশুকে অবহেলা করেন—তাহলে প্রভু নিত্যানন্দ কি মনে করবেন এবং আমাদের এই সনাতন উদার হিন্দুধর্ম্মেরই বা কি গতি হবে?

উষা। হয়ত সদ্‌গতি হবে না; কিন্তু সেজন্য আমি চিন্তিত নই। আমি চিন্তিত হচ্চি আপনি এঁদের জন্য এত ওকালতি কচ্ছেন কেন?

ভাগি। নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকার করার যে মহৎ আনন্দ আমি তাই উপভোগ করছি। যে হতভাগ্য নরপিশাচ আপনার কবিতার নিন্দা করে তার লেখনীর মুখ কালিমালিপ্ত করেছে তার ইহকাল এবং পরকালে অসীম দুর্গতির কথা ভেবে আমি আপনাকে সদয় হতে অনুরোধ করছি।

উষা। ভাগিনেয়বাবু, আপনার অনুরোধ এক্ষেত্রে নিষ্ফল। এতখানি বাগ্মিতা অনর্থক অপব্যয় করলেন।

ভাগি। আচ্ছা, সে ব্যক্তি অর্থাৎ সেই বিজন বাবু যদি স্বয়ং এসে আপনার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করে—তাহলে কি—?

উষা। তাহলেও না। বিজন বাবুকে আমি কখনো দেখিনি আর দেখতেও চাইনে।—আসুন ভেতরে যাই। ফটিক বোধ হয় আমাদের ডাকতে আসছিল, রাস্তার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছে।

উষা নিষ্ক্রান্ত।

ভাগিনেয় কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

শৈলেন। কি ভাবছ?

ভাগি। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] ভাবছি যীশুর কথা—Repent! For the kingdom of Heaven is at hand.

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রেম কুটিরের সম্মুখ। কাল—অপরাহ্ন। ফটকের একপাশে টুলের উপর বসিয়া ফটিক নিদ্রামগ্ন। আর কেহ কোথাও নাই।

পথ দিয়া একটি চীনা ফেরিওয়ালার প্রবেশ। তাহার পিঠে বস্তা; ফটিককে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া সে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—ফটিকের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া নিরীক্ষণ করিল। তারপর বলিল,—গুট মর্নিং স্মাল্, লিট্‌ল বয়।

ফটিক তথাপি নিদ্রিত। চীনাম্যান তখন নিজের ভাষায় কি বলিয়া হি হি করিয়া হাসিল। তারপর পকেট হইতে একটি কাঠি বাহির করিয়া ফটিকের নাকে দিল। ফটিক হাঁচিয়া ফেলিল এবং পরক্ষণেই জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চীনা। নো ক্রাই—গুটম্যান চায়নাম্যান।

ফটিক। হু—হু—হু—[ক্রন্দন]

চীনা। [বিস্মিত ও বিপন্ন] নো ক্রাই লিত্‌ল্ বয়—নো ক্রাই—লাফ্। আই ফানি চায়নাম্যান—হি হি হি হি—লাফ্।

ফটিক। [পূর্ব্ববৎ] হু—হু—হু—

[ক্রন্দন]

চীনা। [ঝুলি হইতে চুষিকাঠি বাহির করিয়া] তেক—গুট বয়—নো ফিয়াল, আই ফানি চায়নাম্যান—

ফটিক। [চুষিকাঠি গ্রহণ ও ক্রন্দন] হু—হু—হু—

পরিতোষ বাবু। [নেপথ্যে] ফটিক! ফটিক!

পরিতোষ বাবু প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে চীনাম্যান দেখিয়া স্তম্ভিত।

চীনা। গুট মলনিং স্যাল—আই চিনী হকার গুট ম্যান—

ফটিক। হু—হু—

পরি। ঘোড়ার ডিম—এ যে ভীষণ ব্যাপার। ফটিক, তোকে মারপিট করছে নাকি?

চীনা। নো স্যাল, আই নো বিট লিতল বয়। আই কম—হি শ্লীপ, আই ওয়েক হিম—হি ক্লাই হু হু হু;—আই গিফ হিম নাইছ তয়, হি ক্লাই হু হু হু; আই পুয়োল চায়নাম্যান—হেলপ-লেছ! [হতাশ মুখভঙ্গী করিল]

পরি। হুঁ। ঘোড়ার ডিম ব্যাপার বড় সুবিধের বোধ হচ্ছে না। একেবারে খাঁটি জাপানী স্পাই। ঘোড়ার ডিম—কি করা যায়! ফটিক, তুই যা, চট করে আমার লাঠিটা নিয়ে আয়।

[ফটিকের প্রস্থান]

চীনা। বয় ভেলি সরি স্যাল—ক্লাই; আই গিব হিম তয়—নাউ হি প্লে, হ্যাপি—লাফ্ হি হি হি—

পরি। হুঁ—লাফ হি হি হি ঘোড়ার ডিম। তোমার মতলব কি আর আমি বুঝিনি? চুষিকাঠি ঘুষ দিয়ে ঘোড়ার ডিম বাড়ীর মধ্যে ঢোকবার ফিকির করেছিলে!

চীনা। ইয়েস স্যাল—আই ব্রিং ভেলি নাইছ টিংস—সিল্ক, তয়, লিবন—ভেলি চীপ—

পরি। [দৃঢ়ভাবে] জাপানী সায়েব, তুমি ঘোড়ার ডিম সটান হিঁয়াসে চলা যাও। হিঁয়া ওসব চালাকি নেই চলেগা—

চীনা। ভেলি গুট স্যাল, আই গট জাপানী সিল্ক—

[বস্তা নামাইল]

পরি। নো নো সায়েব, তুম স্যাকা সাজতা হায় কাহে? ঘোড়ার ডিম, তুম সিগগির চলা যাও—নেই তো ঘোড়ার ডিম—

চীনা। ভেলি গুট স্যাল—[বস্তা তুলিয়া] আই গো ইন স্যাল—শো বিউটিফুল টিংস—সিল্ক, তয়, লুকিং গ্লাস—[ফটকের ভিতর প্রবেশের উদ্যোগ]

পরি। [চীৎকার করিয়া] ওরে ফটিক। শীগগির লাঠি নিয়ে আয়—ঘোড়ার ডিম—জাপানীটা ঘরে ঢুকতে চায়, এখনি বাড়ীর প্ল্যান তৈরী করে ফেলবে ঘোড়ার ডিম—

[ঊষা ও লাঠি হস্তে ফটিকের প্রবেশ]

ঊষা। কি হয়েছে মামা—

পরি। [লাঠি হাতে লইয়া] ঘোড়ার ডিম একটা জাপানী স্পাই জোর করে বাড়ী ঢুকতে চায়। শৈলেনটাও যে ছাই এই সময় বেড়াতে গেল। নাউ—ঘোড়ার ডিম—গো—

চীনা। [টুপিতে হাত দিয়া সহাস্যে] গুট মলনিং ম্যাদাম্। আই নো জ্যাপ, আই চায়না ম্যান—ভেলি গুট চায়নাম্যান—হংকং চায়নাম্যান—[খানিকটা চীনাভাষায় কথা কহিল আই নো দালতি [dirty] জ্যাপ, ব্যাড ম্যান জ্যাপ [নাক সিঁটকাইল]

ঊষা। মামা, ও জাপানী হতে যাবে কেন? ও ত চীনে ফেরিওয়ালা।

পরি। না না তুমি বোঝ না ঊষা। ঘোড়ার ডিম একেবারে খাঁটি জাপানী গুপ্তচর। গোঁফ দেখছ না, একদম পুরোদস্তুর সমুরাই প্যাটার্নের—জেনারেল নোগুচির মত।

উষা। সব চীনেম্যানেরই ত ঐ রকম গোঁফ হয়।

পরি। ঘোড়ার ডিম তুমি কিছু জানো না। সব চীনেম্যানের গোঁফ তুমি দেখেছ ?

চিনা। লিবন ম্যাদাম, ভেলি গুট্ লিবন—লেদ্ ব্লু গ্রীন—সিল্ক লিবন ভেলি চীপ্।

উষা। আসুক না মামা ভেতরে, রিবন্ আছে বল্‌ছে—আমার কিছু রিবনের দরকার, আর যদি পছন্দসই ব্লাউজের সিল্ক থাকে—

পরি। ঘোড়ার ডিম, মেয়েমানুষের কাছে সিল্ক আর গয়নার নাম করলে আর তাদের জ্ঞান থাকে না। তুমি কি ভেবেছ ওর ওই বস্তায় সিল্ক আর রিবন আছে। মোটেই নয় ঘোড়ার ডিম।

উষা। তবে কি আছে ?

পরি। গোলা বারুদ বোমা, ঘোড়ার ডিম আরো কত কি।

উষা। [হাসিয়া ফেলিয়া] তা ও গোলা বারুদ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছে কেন ?

পরি। তা কি ঘোড়ার ডিম বলা যায় ? ওর মতলব হচ্ছে বাড়ীতে ঢুকে বাড়ীর প্ল্যান তৈরী করা।

উষা। সে কি ! কেন ?

পরি। তাই যদি বুঝতে পারবে ঘোড়ার ডিম তবে আর ভাবনা কি ! জাপানী গভর্ণমেণ্ট কি ঘোড়ার ডিম ঘাস খায় ! তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র আঁটছে। আজ নয় কাল তারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করবেই।

উষা। তা করুক, কিন্তু তাই বলে মামা, চীনে ফেরিওয়ালা বাড়ী ঢুকতে পাবে না ?

পরি। না না ঘোড়ার ডিম উষা তুমি বাড়ীর ভেতরে যাও, আমি

ব্যাটাকে বিদেয় করছি। [লাঠি নাড়িয়া] জাপানী সাহেব, আমি তোমার সব ফন্দি বুঝে নিয়েছি, তুমি ঘোড়ার ডিম চট্‌পট্ সরে পড়।

চীনা। [লাঠি নিরীক্ষণ করিয়া] স্তিক্? আই গট্ নো স্তিক্। বট গুট দ্যাগাস্, সোল্‌দ্ স্বাগাল্,—নাইছ—সি?

পরি। শুনলে ত? ঘোড়ার ডিম তলোয়ার ছোরা ছুরি নিয়ে বেড়াচ্ছে। সাংঘাতিক ব্যাপার ঘোড়ার ডিম; তাড়ালেও যায় না যে!

চীনা। কম্ সি, ভেলি নাইছ স্বাগাল্—বিউটিফুল।

[ভিতরে প্রবেশের উদ্যোগ]

পরি। ওরে ঘোড়ার ডিম। এ যে নাছোড়বান্দা স্পাই; ভেতরে ঢুকবেই। সায়েব, হাম বুড়া আদমি হ্যায়, তার ওপর কোমরে ব্যথা; কিন্তু যদি জবরদস্তি কর তাহলে এই লাঠি ঘোড়ার ডিম মাথায় বসিয়ে দেব। [লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন]

চীনা। হোয়াৎ! বিৎ মি? [বস্তা ফেলিয়া] কামান [মুষ্টি ঘুরাইতে লাগিল]

পরি। ঘোড়ার ডিম!

ফটিক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, পরিতোষ বাবু লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন, চীনাম্যান মুষ্টি ঘুরাইয়া নাচিতে লাগিল। উষা স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। ভগিনেয় প্রবেশ করিল।

ভাগি। এ কি! ব্যাপার কি! Open air vaudeville হচ্চে নাকি?—ফটিক স্তব্ধ হও। [ফটিক নীরব হইল] এটা কি হচ্চে বলুন দেখি!

উষা। মামা চীনাম্যানকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন।

ভাগি। আরে তাইত। এ যে ফিচিং সায়েব দেখছি।—ওহে ফিচিং, নিরস্ত হও। পরিতোষ বাবু, লাঠি নামান।

পরি। ঘোড়ার ডিম ভাগিনেয়, লোকটা দুর্দ্দান্ত গুপ্তচর। জোর করে বাড়ী ঢুকতে চায়।

ভাগিনেয়কে দেখিয়া চীনাম্যানের মুখ প্রশান্ত হাসিতে আরো থ্যাবড়া হইয়া গেল।

চীনা। গুট মলনিং পীজন বাবু, আই লিংচু, নো ফিচিং—

ভাগি। হ্যাঁ হ্যাঁ লিংচু লিংচু। তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর। [হস্ত উত্তোলন, লিংচু মুষ্টি নামাইল, পরিতোষ বাবু লাঠি নামাইল] এইবার ঘটনাটা বলুন ত, আপনাদের মনোমালিন্য কিসের জন্য? ফিচিং সাহেব কি আরসোলা দাবী করেছে? তা যদি করে থাকে—

পরি। ঘোড়ার ডিম আরসোলা নয়, ও আমার বাড়ীর প্ল্যান তৈরী করতে চায়।

ভাগি। প্ল্যান! কি উদ্দেশ্যে? ফিচিং তুমি কি সরকারী সারভেয়র হয়েছ? প্লান তৈরী করতে চাও কেন?

চীনা। পীজন বাবু, হি ত্রাই বিৎ মি, স্তিক; আই সে—কামান! [হস্ত ঘূর্ণন]

ভাগি। বেশ বেশ, তুমি বীরপুরুষ। এখন ঠাণ্ডা হও।

উষা। ও আপনাকে পীজন বাবু বলে ডাকছে কেন?

ভাগি। [ঘাড় চুলকাইয়া] মানে ফিচিং সায়েব আমাকে বড় ভালবাসে। ওর কাছ থেকে একটা সিগারেট কেস কিনেছিলুম, সেই থেকে প্রণয়।

উষা। কিন্তু তাই বলে পীজন বাবু বলবে?

ভাগি। তা জানেন না? চীনেরা যাকে ভালবাসে তাকে পীজন ব'লে ডাকে। প্রেমের পায়রা আর কি।

চীনা। ইযেছ, পীজন বাবু ভেলি গুটম্যান্—

ভাগি। [অস্ফুট স্বরে] নাঃ তোমাকে বিদেয় করতে হচ্চে, তুমি এখনি সব মাটি করবে। চল ফিচিং আমার বাড়ী; অনেক জিনিষ কেনবার আছে—

পরি। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাগিনেয়, তুমি ওকে তাড়াও নইলে ঘোড়ার ডিম ভীষণ গোলমাল বাধাবে।

উষা। কিন্তু আমি যে রিবন কিনব মামা—আর, কিছু সিল্ক—

চীনা। ইয়েস্, লিবন ভেলি ফাইন্ লিবন, লেদ্ ব্লু গ্রীন্—

ভাগি। তাইত। এখন কি করা যায়? তাড়াবো কি তাড়াবো না? [চিন্তা] আচ্ছা, ঠিক হয়েছে—চল চিংফু তুমি আমার বাসায়; তারপর তোমার ঝোলায় কত রিবন আর সিল্ক আছে দেখা যাবে।

পরি। সাবধান! ওর ঝোলায় ঘোড়ার ডিম স্রেফ গোলা আর বারুদ আছে।

ভাগি। কুছ পরোয়া নেই। গোলা বারুদ সব আমি বাজেয়াপ্ত করে কেল্লায় পাঠিয়ে দেব।

উষা। কিন্তু—

ভাগি। আপনি ভাববেন না। চিংফুর ঝোলায় যতক্ষণ এক টুকরো রিবন আছে ততক্ষণ আমার হাতে ওর নিস্তার নেই—ঝোলা উজোড় করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। [লিংচু'র গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া] চিংফু, চল ত যাদু—

চীনা। [প্রসন্ন হাস্যে] পীজন বাবু গুট্ম্যান—বাই সিগালেট্ কেস—পীজন বাবু—

ভাগি। চোপ রও। ফের পীজন বাবু বলেছ ত ঘাড় মটকে দেব।

পরি। কিন্তু ভাগিনেয়, সাবধানে থেকো ঘোড়ার ডিম—

ভাগি। আজ্ঞে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—গোলা বারুদ আমার কিছু

করতে পারবে না। চিংফুর পায়রা-প্রণয়কেই ভয় বেশী। চল চিংফু—আর নয় [লিংচুকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া প্রস্থান]

পরি। নাঃ ঘোড়ার ডিম, ভাগিনেয় কাজের লোক আছে। উষা তোমাকে ঘোড়ার ডিম সঙ্গে নিযে বেড়াতে যাবার অনুমতি চাইছিল, না? তা তুমি যেতে পার। ছোকরা তালেবর আছে—ও না এসে পড়লে ঘোড়ার ডিম জাপানীটা প্লান তৈরী করে তবে ছাড়ত।

উষা। হ্যাঁ মামা।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

পরিতোষ বাবু ও শৈলেন ড্রয়িং রুমে আসীন। দুজনের হাতে চায়ের বাটি। কাল প্রভাত। উষা একটু বেলা পর্য্যন্ত ঘুমায় তাই এখনো যোগ দিতে পারে নাই।

পরি। এ ক'দিন ঘোড়ার ডিম তোমার ভাব দেখে ত এমন কিছু বোধ হল না যে তুমি ওকে আগে থাকতেই চেন।—তা কথাবার্ত্তা যদিও একটু অদ্ভুত রকমের তবু ছোকরাটি মন্দ বোধ হল না। বিশেষত জাপানীটাকে সেদিন যেভাবে তাড়ালে। বড়ঘরের ছেলে, পয়সা আছে বলছ। বদ্‌খেয়ালের মধ্যে বাঙলা কাগজ চালায়। তা —সে ঘোড়ার ডিম বড়মানুষের ছেলেদের একটা বাতিক না থাকলে সময় কাটবে কি করে? আমি 'জাপানী গুপ্তচর' বলে যে প্রবন্ধটা লিখছি সেটা না হয় ওর কাগজেই দেব। কি নাম বল্লে কাগজখানার?

শৈলেন। উষার কাছে এখন ফাঁস করে দিও না—'মন্দাকিনী'।

পরি। তা দেব না। কিন্তু তোমরা দুই বন্ধুতে মিলে ঘোড়ার ডিম—মেয়েটার বিরুদ্ধে কোন রকম ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছ না ত?

শৈলেন। তুমি কি পাগল হয়েছ মামা! আসল কথা, বিজন ভয় কচ্চে যে, উষা যদি আগে জানতে পারে যে ও-ই বিজন বোস তাহলে হয়ত—যাক, তোমার অমত নেই ত?

পরি। ছোকরা দেখতে শুনতে ত মন্দ নয়—তা উষার যদি ওকে পছন্দ হয় তাহলে—

শৈলেন। থামো—উষা আসছে।

দুজনে চায়ের বাটিতে মনোবিনেশ করিলেন।

উষার প্রবেশ।

উষা। বড্ড দেরী হয়ে গেছে, না? কি যে আমার ঘুম, সাতটার আগে কিছুতেই ভাঙে না। ফটিক কৈ?

শৈলেন। তাকে পাঠিয়েছি ভাগিনেয় বাবুকে ডেকে আনতে। ওর পাগলাটে ধরণের কথাবার্ত্তা আমার বেশ লাগে।

উষা। [ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া] পাগলাটে ধরণের!

শৈলেন। তা নয় ত কি! আমার বোধ হয় লোকটির মাথায় একটু ছিট্ আছে।

উষা। [মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া] ভারি ত জানো তুমি! তোমার —তোমার বন্ধু ঐ অজিত গুহর চেয়ে ঢের ভাল।

শৈলেন। [চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া] অজিতের চেয়ে ভাল। কিসে ভাল? রূপে, না গুণে, না বিদ্যায়!

উষা। সব তাতেই। তোমার বন্ধুদের মধ্যে এমন একটাও নেই—

[বলিতে বলিতে হঠাৎ মহা লজ্জায় থামিয়া গেল]

পরি। কি বলে ভাল, যদি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনাই করতে হয় শৈলেন, তাহলে ঘোড়ার ডিম এ কথা না মেনে উপায় নেই যে ঐ অজিত গুহটা আস্ত জিরাফ, অশোক সাণ্ডেলটা নিরেট

গুণ্ডা, হসিত সামন্তটার যেমন ভাল্লুকের মত চেহারা তেমনি উল্লুকের মত বুদ্ধি—আর ঐ কিংশুক গুপ্তটা—ওটাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

উষা। [সোৎসাহে] আমারও—

শৈলেন। আসল কথা, তোমরা আমার বন্ধুদের দেখতে পারো না।

উষা। আর মামা—সেই মীনধ্বজ হালদার—!

পরি। সেটাকে ঘোড়ার ডিম শিম্পাঞ্জি বললে শিম্পাঞ্জির মানহানি করা হয়।

উষা। আর জানো মামা, এঁরা সব কেউ এক বর্ণ বাঙলা লিখতে জানেন না।

পরি। সব ঘোড়ার ডিম আন্‌কোরা গোবার বাচ্চা কিনা!

শৈলেন। ওরা সব ইংরাজী শিক্ষা পেয়েছে—তাই—

পরি। আমরাও ত ইংরিজী শিক্ষাটা—আসটা পেয়েছি রে বাপু, উষাও ত ঘোড়ার ডিম জুতোটা মোজাটা পরে, চা বিস্কুটও খায় আর ইংরিজীতে তোমার ঐ সবকটা বন্ধুর ঘোড়ার ডিম কান কেটে নিতে পারে। কিন্তু কই অমন ট্যাঁশফিরিঙ্গি ত হয়ে যায়নি। তুমিও ত ঘোড়ার ডিম টেবলে বসে খানা ডিনার খেয়ে থাকো, কিন্তু তাই বলে কি বাঙলা কথা ভুলে গেছ?

উষা দাদার বন্ধুদের এই লাঞ্ছনা খুব উপভোগ করিতেছিল। দাদার উপর প্রতিশোধ তুলিবার এত বড় সুযোগ সে বড় পায় না। তাই তার এত আমোদ।

সে গম্ভীর মুখে বলিল—'এক কথায় দাদার বন্ধুগুলো সব একদম বদ্দি।'

শৈলেন। সব বন্ধু—একটাও বাদ নয়?

উষা। একটাও বাদ নয়।

শৈলেন। [দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া] আচ্ছা বেশ, এর বিচার পরে হবে।

ভাগিনেয় বোসের প্রবেশ

ভাগি। মাফ করবেন, আপনারা বোধ হয়, আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?

শৈলেন। বোধ হয় কি রকম—নিশ্চয়ই ডেকে পাঠিয়েছিলুম।

ভাগি। ঠিক ধরেছি তাহলে। চা খাবার আগে একটু বেড়িয়ে আসব বলে বেরুচ্চি দেখি আপনার ফটিক আমার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্চে। আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝে নিলুম। পাশ কাটিয়ে সটান এখানে চলে এসেছি। তার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে দেবার আর প্রবৃত্তি হল না। সে বোধ হয় নিদ্রিত অবস্থায় এখনো আমার সিংহদ্বারে পাহারা দিচ্ছে।

পরি। বোসো বোসো ভাগিনেয়, উষা চা দাও।

ভাগিনেয় উপবিষ্ট হইল।

শৈলেন। [সহসা] আপনি বাঙলা জানেন ?

ভাগি। [অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া] ওর নাম কি, এতক্ষণ কি আমি না জেনে চীনে ভাষায় কথা কইলাম !

উষা। দাদার যত সব অদ্ভুত কথা।

শৈলেন। অর্থাৎ আমি জানতে চাই আপনি বাঙলায় পদ্য লিখতে পারেন কিনা ?

ভাগি। একবার এক বন্ধুর বিয়েতে লিখেছিলাম কিন্তু ছাপা হয়নি।

উষা। [সাগ্রহে] কি পদ্য বলুন না !

ভাগি। তার প্রথম দু'ছত্র কেবল মনে আছে—

'গজুর অন্য বিবাহ।
পদ্মবনে ঢুকিবে একটি বরাহ—'

[পদ্য শুনিয়া উষা মুষড়িয়া গেল]

শৈলেন। [খুসী হইয়া] খাসা পদ্য ত! আপনিও দেখছি তাহলে একজন কবি। অবশ্য ঠিক উষার সঙ্গে এক শ্রেণীর না হলেও—

উষা। দাদা—ফের—

শৈলেন। না না তোমার সঙ্গে যে ভাগিনেয় বাবুর তুলনাই হয় না। সে আমি জানি—

উষা। দাদার কথা শুনবেন না, খালি আমাকে জ্বালাতন করবার চেষ্টা। আপনি নিশ্চয় ভাল কবিতা লিখতে পারেন। দাদার বন্ধুরা কেউ এক অক্ষর বাঙলা লিখতে জানে না। আচ্ছা, আপনার লেখা একটা ভাল পদ্য বলুন না।

ভাগি। দেখুন, আমি যে ভাল পদ্য লিখতে পারি এটা আপনার মুখ থেকে শুনলাম বলেই সত্য বলে বিশ্বাস হচ্ছে। এবং আপনার দাদার বন্ধুরা যা পারে না আমি তাই পারি, এ কথা প্রমাণ করবার জন্য যদি আমাকে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত আছি —পদ্য লেখা ত দূরের কথা।

উষা। [সোল্লাসে] আচ্ছা বেশ। তাহলে একটা বেশ ভাল— এই ভালবাসার পদ্য বলুন।

শৈলেন। ভাগিনেয় বাবু, কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনি যদি আর কোনও কবির কাব্য নিজের বলে এখানে চালিয়ে দেন, তাহলে তস্কর বলে আপনাকে সনাক্ত করবার ক্ষমতা আমাদের কারুর নেই— এক উষা ছাড়া, কিন্তু উষার ভাবগতিক দেখে বোধ হচ্ছে সে আপনাকে ধরিয়ে দেবে না।

ভাগি। কি করতে হবে বলুন? সকল রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে আজ আমি বদ্ধপরিকর।

শৈলেন। আপনাকে একটি ইংরিজী কবিতা তর্জমা করতে হবে।

ভাগি। বেশ কথা। কবিতা বলুন।

শৈলেন। ঊষা, বিষয় নির্ব্বাচনের ভার তোমার ওপর। তুমি একটা কবিতা বল।

ঊষা। (কিছুক্ষণ ভাবিয়া তারপর লজ্জিত নতমুখে)

When we two parted
In silence and tears
Half broken-hearted
To sever for years—তারপর আর—তারপর আর মনে পড়ছে না—

শৈলেন।

Pale grew thy cheek and cold
Colder thy kiss
Truly that hour foretold
Sorrow to this!

ভাগি। কঠিন পরীক্ষা। আচ্ছা কাগজকলম দিন।

পরি। ঘোড়ার ডিম! এইখানে বসে বসেই পদ্য লিখবে নাকি?

ভাগি। আজ্ঞে হ্যাঁ। ফটিক যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমতে পারে তখন আমি বসে বসে পদ্য লিখব এ আর বিচিত্র কি?

ঊষা কাগজ পেনসিল আনিয়া দিল ও উৎসুক হইয়া লিখনরত ভাগিনেয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল…

ভাগি। হয়েছে। ঠিক যে বায়রণের যোগ্য হয়েছে তা বলতে পারি না—তবু, আচ্ছা শুনুন—

যখন মোরা দোঁহে বিদায় নিয়েছিনু
 নীরব নীর-নত চোখে,
আধেক ভাঙা বুকে সুখের স্মৃতি লয়ে
 সাঁঝের ম্লান দিবালোকে .
কপোল হল তব পাংশু হিমবৎ
 অধর হল হিমতর,
তখনি জানিলাম সুখের বিভাবরী
 পোহাবে ব্যথা জরজর।

ঊষা। [মুগ্ধভাবে ক্ষণকাল নীরব] চমৎকার হয়েছে। এমন কি ছন্দটি পর্য্যন্ত !

শৈলেন। ও কিছুই হল না,

Truly that hour foretold
Sorrow to this—ওর কি এই তর্জ্জমা !

ঊষা। আপনি দাদার কথা শুনবেন না, সত্যিই ভারী সুন্দর হয়েছে।

ভাগি। [পরিতোষ বাবুর দিকে ফিরিয়া] আপনি কি বলেন ?

পরি। ও ইংরিজী বাঙলা কোনটারই ঘোড়ার ডিম কিছু মানে হয় না।

ভাগি। যাক তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সমালোচনা দুই ভাগে বিভক্ত, একজন বলছেন চমৎকার হয়েছে আর একজন বলছেন কিছুই হয়নি। এক্ষেত্রে যিনি কবি আমি তাঁর মন্তব্যটিই গ্রহণ করলাম। কারণ শাস্ত্রে বলেছে, 'কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি'—

শৈলেন। উঁহার মন্তব্য কিন্তু অন্য রকম হত যদি আপনি না লিখে আমার কোনো বন্ধু ঐ কবিতাটী লিখতেন।

উষা। [আরক্তিম হইয়া] তার মানে ?

ভাগি। মানে অতি সহজ—কবিকে না জানলে তাঁর কাব্য বোঝবার সুবিধা হয় না। আপনি আমাকে জানেন বলেই এত সহজে আমার কবিতাটি উপভোগ করতে পারলেন। ধরুন আপনাকে জানবার আগে যদি আমি আপনার 'অস্ফুট' নামক ঐ অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থটি পড়তাম ; হয়ত ভাল না বুঝতে পেরে, সম্যক রসগ্রহণ না করে আমি ওটির নিন্দা করতাম। কিন্তু সে সমালোচনা কি যথার্থ হত ? কখনই না!

শৈলেন। আপনার যুক্তির মধ্যে একটুখানি গলদ রয়ে গেল। তা থাক, আমাকে এবার একবার উঠতে হবে, গোটা কয়েক চিঠি লেখা দরকার। মামা তুমিও উঠছ নাকি

পরি। ঘোড়ার ডিম হ্যাঁ। কোমরটাতে মালিশ করাতে হবে, সেই ব্যথাটা এখনো গেল না। দেখি ফটিক এলো কিনা।

[প্রস্থান করিলেন]

শৈলেন। উষা, ভাগিনেয় বাবু তাহলে তোমার জিম্মায় রইলেন। উহ কবিতে যত ইচ্ছা কাব্য-চর্চ্চা হোক কিন্তু আমার বন্ধু বাঙলা লিখতে পারে না একথাটা ভবিষ্যতে আর বোলো না।

[নিষ্ক্রান্ত]

উষা ও ভাগিনেয় কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল। উষার বুকের ভিতরটা দুরদুর করিতে লাগিল। এই লোকটির সহিত একলা থাকিলেই উষার ঐ রকম হয়।

ভাগি। কাল-পরশুর মত চলুন আজ বিকেলেও কোনও দিকে বেড়িয়ে আসা যাক।

উষা। [নিম্নস্বরে] আজ কোন্‌দিকে যাবেন ?

ভাগি। যেদিকে হয়। সোজা একটা রাস্তা ধরে সহর-বাজার পার হয়ে এমন কোথাও গিয়ে পৌছনো যাক যেখানে মানুষ নেই, গরু-ভেড়া নেই, শুধু আমি আর—শুধু দুজন পথিক—

উষা। আর যদি বাঘ থাকে ?

ভাগি। থাকুক বাঘ। বাঘ না থাকলে পথিক দুজনের আনন্দ-যাত্রাপথে বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে ? বাঘ থাকাই চাই।

উষা। সেদিন ডিঘড়িয়া পাহাড়ে বাঘের নামে কিন্তু বৈচিত্র্যের বদলে আতঙ্কই এসেছিল।

ভাগি। [কিছুক্ষণ সুখ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া] ওঃ—দিঘড়িয়া পাহাড় ! চলুন আজ সেইখানেই যাওয়া যাক।—আচ্ছা উষা—[বলিয়াই সহসা থামিয়া গিয়া রাগ করলে নাকি ? [উষা মাথা নাড়িল] আমি তোমার চেয়ে বয়সে অন্তত সাত আট বছরের বড়, তার ওপর তোমার দাদার—ইয়ে—সমবয়সী। আর আম ন আলাপও হল প্রায়—ক'দিন হ'ল উষা ?

উষা। [মৃদুস্বরে] আজ নিয়ে ন'দিন।

ভাগি। ন' দিন ! দুদিন নয়, চারদিন নয় ; এক হপ্তা নয়—পূরো ন'দিন ! সুতরাং তোমাকে আমি উষা বলেই ডাকবো, আর 'আপনি' বলতে পারব না।—হ্যাঁ কি কথা হচ্ছিল ?

উষা। ডিঘড়িয়া পাহাড়।

ভাগি। হ্যাঁ ডিঘড়িয় পাহাড়। চল আজ সেখানেই যাওয়া যাক।

উষা। এত জায়গা থাকতে আজ সেখানে কেন।

ভাগি। সেখানে—আমার টুপী হারিয়ে গেছে খুঁজে দেখতে হবে।

উষা। [হাসিয়া] আপনার টুপী আর খুঁজে পাবেন না।

ভাগি। পাবেনা? বেশ, কিন্তু আর কিছু যদি হারিয়ে থাকে সেটা ত খোঁজা দরকার।

ঊষা। [আরক্তিম নতমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া] না, আমি ওখানে যাব না। আমার বড্ড ভয় করবে। কি জানি যদি ফের কোনও রকম দুর্ঘটনা হয়?

ভাগি। [অনেকক্ষণ ঊষার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া] সম্প্রতি তোমার ভাগ্যে একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ছাড়া আর কোনও আশু বিপদ ত আমি দেখছি না?

ঊষা। [সকৌতুকে] আপনি হাত গুণতেও জানেন নাকি?

ভাগি। জানি বৈকি।

ঊষা। [করতল প্রসারিত করিয়া] কৈ গুণুন দেখি আমার হাত। কি দুর্ঘটনা হবে শুনি

ভাগি। [ঊষার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর ভাবে] শীগগির তোমার বিয়ে হবে—

ঊষা। [হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া] যান!

ভাগি। তোমার দাদার এক বন্ধুর সঙ্গে—

ঊষা। [রাগ করিয়া] ছেড়ে দিন—আমার হাত দেখতে হবে না।

ভাগি। বেশ ছেড়ে দিচ্ছি—[ঊষার করতলে একটি চুম্বন করিয়া হাত ছাড়িয়া দিল]

ঊষা। [ক্রন্দনোন্মুখী হইয়া] আর আমি আপনার সঙ্গে কখ্খনো—

ভাগি। কখ্খনো ছেলেমানুষী কোরো না। যেটা নিলাম ওটা গণৎকারের দক্ষিণা।—ঊষা একটা ভারী গোপনীয় কথা তোমায় বলব?

ঊষা। আমি শুনতে চাই না—

ভাগি। তুমি না চাইলেও আমি বলবই।—উষা, আমাকে বিয়ে করবে?

উষা। যাও!

[উষা দুহাতে মুখ ঢাকিল]

ভাগি। উষা—

উষা। যাও।

ভাগি। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] বারবার যাও বলছ? বেশ, চললাম। [দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া] একটা গুরুতর অপরাধ স্বীকার করবার ছিল— তা আর হল না।

উষা। কি অপরাধ শুনি!

ভাগি। [ফিরিয়া আসিয়া] আগে বল আমায় বিয়ে করবে?

উষা। না।

ভাগি। করবে না?

উষা। না।

ভাগি। দুবার না বললে। বারবার তিন বার বললেই বুঝব মনের কথা বলছ। বিয়ে করবে না?

[উষা নীরব। ভাগিনেয় দুহাত ধরিয়া উষাকে জোর করিয়া তুলিল]

ভাগি। উষা—

উষা। আগে শুনি কি অপরাধ।

ভাগি। আগে বল রাগ করবে না।

উষা। আগে শুনি।

ভাগি। আচ্ছা বলছি। রাগ করলেও এখন ত আর কথা ফিরিয়ে

নিতে পারবে না—বিয়ে করতেই হবে। উষা, আমার নাম ভাগিনেয় নয়, আমার নাম—বিজন বোস।

উষা। [বিস্ফারিত নেত্রে] তুমি—আপনি—তুমি আপনি—

ভাগি। তুমি—তুমি। 'আপনি' নয়।

উষা। তুমি—দাদার বন্ধু—

বিজন। হ্যাঁ। বলেছিলাম কিনা গণনা করে যে তোমার দাদার বন্ধুর সঙ্গে শীগগির তোমার বিয়ে হবে?

উষা। তুমি 'মন্দাকিনী'র—

বিজন। হতভাগ্য সম্পাদক।

উষা। যাও, তোমার সঙ্গে আমি আর একটী কথাও কইব না।

বিজন। কথা কইবে না? তুমি জানো এই ক'দিনে আমি 'অস্ফুট' থেকে সমস্ত কবিতা আগা গোড়া মুখস্থ করে ফেলেছি। সত্যি বলছি উষা, তোমাকে যতদিন না চিনতাম ততদিন তোমার কাব্যের সৌরভ আমার প্রাণে গিয়ে পৌঁছোয়নি। এখন বুঝতে পেরেছি, আধ-ফুটন্ত অপরিণত প্রাণের কী তরল মধুর সীধু ঐ বইখানির মধ্যে ভরা আছে। শুনবে? আচ্ছা—'আশ্রয় যাজ্ঞা' কবিতাটি আবৃত্তি করছি—

উষা। [বিজনের মুখ চাপিয়া ব্যাকুল ভাবে] না—না তুমি থামো—

[সহসা শৈলেনের প্রবেশ। উষা লজ্জায় জড়সড়]

শৈলেন। এ কি! কবি আর সমালোচকে দিব্যি ভাব হয়ে গেছে দেখছি যে!

বিজন। কবি এবং সমালোচকে যেখানে মিলন হয় সে স্থান মহাপুণ্যতীর্থে পরিণত হয়—মানো কি না?

শৈলেন। নিশ্চয় মানি।

বিজন। ব্যস। আজ থেকে দেওঘরও এক মহাতীর্থ হল।

উষা। দাদা, কি দুষ্টু তুমি! আগে যদি জানতে পারতুম—তাহলে কিন্তু—

শৈলেন। [উষার গালে আঙ্গুলের টোকা মারিয়া] আগে জানলে সমস্ত ভেস্তে যেত—না?—উষা, আমার সব বন্ধুরাই একদম রদ্দি—কি বলিস?

উষা। [বিনতভুবনবিজয়ীনয়না] একদম রদ্দি!

শৈলেন। আমাকে একবার পোষ্ট অফিস যেতে হবে। বিজন, আসছ নাকি?

বিজন। তুমি এগোও। সামান্য একটু কাজ সেরে আমি এই এলাম বলে।

[শৈলেন প্রস্থান করিল।]

বিজন। [উষার খুব কাছে গিয়া] সামান্য কাজটুকু সেরে নিতে পারি।

উষা। [বুকে মুখ গুঁজিয়া] না—

বিজন দুই আঙ্গুল দিয়া উষার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া গভীর স্নেহদৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল।

বিজন। পারি?

উষা চোখ খুলিল না, অনুমতিও দিল না। সহসা পরিতোষ বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া আবার দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। অস্ফুটস্বরে কহিলেন—ঘোড়ার ডিম!

১৩৩৭

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬